বিদ্যুতের
রূপকথা
পুথিপত্র
অরূপ চক্রবর্তী

বিদ্যুতের রূপকথা

অজয় চক্রবর্তী

পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীমণীন্দ্র ঘটক

বন্ধুবরেষু

প্রসঙ্গত

রূপকথার রাজ্যে অনেক অসম্ভবই ঘটে যায়। রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্যি-দানারা পলকে অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড বাধায়, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় অচেতন রাজকুমারীর চেতনা ফেরে ; ব্যাঙ, মাছ, শেয়ালের মতো প্রাণীরাও রাজকুমারকে সাহায্য করে অসম্ভব সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকন্যা আর রাজত্ব লাভ করতে। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এমন সব আশ্চর্য ঘটনা আছে। বিজ্ঞানের রাজ্যেও অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, অনেক কষ্টকল্পনাই সেখানে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসেও আছে রূপকথার উপাদান। সত্য অনেক সময়ই কল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। তাই বাস্তবের কথা অনেক ক্ষেত্রে রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর মনে হয়। বিজ্ঞানের যে-কোন বিষয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসরণ করলেই এ কথার সত্যতা ধরা পড়ে। বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য হলো তড়িৎ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের কথা। কাজেই, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিদ্যুতের রূপকথা'। রূপকথায় সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেমন রাজকুমারী জেগে উঠেছিল, বিদ্যুতের রূপকথায় তেমনি আছে এক হতাশ বুক-বাইণ্ডারের কথা, একজন বিজ্ঞানীর স্নেহস্পর্শে যাঁর ঘুমন্ত প্রতিভা জেগে উঠেছিল। রূপকথায় এক ব্যাঙের কথা পড়েছিলাম যে-ব্যাঙ সমুদ্রের অতল থেকে কী একটা খুঁজে এনে দিয়ে রাজকুমারকে একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল। বিদ্যুতের রূপকথাতেও আছে এক ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙের কথা যে-ব্যাঙ বিজ্ঞানী গ্যালভানিকে দুর্লভ সম্মান এনে দিয়েছিল যার দাম রাজত্ব আর রাজকন্যের চেয়ে কম নয়। রূপকথায় এক জাদুকরের কথা পড়েছিলাম যে-জাদুকর তার জাদুবাক্সের সাহায্যে দূর থেকে কথাবার্তা চালাতে পারতো তার সাকরেদদের সঙ্গে। বিদ্যুতের রূপকথায় এমনি জাদুকর মোর্স, এমনি জাদুকর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং বিজ্ঞানী মার্কনি।

বিজ্ঞানের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের কাছে, বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এবং বিজ্ঞানানুরাগীদের কাছে। পাঠ্যবইতে বিজ্ঞান আসে কিছু সূত্র আর তত্ত্বের রূপ ধরে। কিন্তু কেমন করে সে-সব সূত্র আর তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে সে-সব কথা সেখানে অনুচ্চারিত থেকে যায়। ফলে বিজ্ঞানের ছাত্ররা এবং খণ্ডিত দৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে দেখে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো চিত্রের মতো। সমগ্র বিজ্ঞান যে আসলে একটিই দৃশ্যপট তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। দৃষ্টির এই সামগ্রিকতা গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। বিজ্ঞানের কোন সূত্রই আকাশ থেকে পড়ে না। গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো আর তা দেখে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন এ ধরনের কিংবদন্তী এবং বিশ্বাস চালু থাকলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোন আবিষ্কারই এভাবে ঘটে না। সমস্ত আবিষ্কারের জন্যই পটভূমি রচিত হওয়া চাই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া চাই। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের গবেষণা, তাঁর ছাত্র কেপলারের গবেষণা এবং গ্যালিলিওর নানান পরীক্ষা-

নিরীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের পটভূমিতেই মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছিল। গ্যালভানির প্রাণী-বিদ্যুৎ মতবাদের পটভূমিতেই ভোল্টা তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবনের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তবু অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিছক দৈব ঘটনা। অনেক বিজ্ঞানীও এ বিশ্বাসে অটল যে, দৈব যোগাযোগ ছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভবপর নয়। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সৌভাগ্যক্রমে আপেল পড়তে দেখেছিলেন বলেই নিউটন মহাকর্ষ সূত্রটির হদিশ পেয়েছিলেন। সবিনয়ে বলছি, এরূপ বিশ্বাসের মূলে আছে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা।

কোন কথাকে আমরা সত্য বলে মানব? এ সম্পর্কে দার্শনিকেরা নানান প্রমাণের কথা বলেন। তার মধ্যে একটি হলো, বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য। কাজেই কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি বলেন যে, পড়ন্ত আপেলই নিউটনকে মহাকর্ষ সূত্রের সন্ধান দিয়েছে তাহলে আর সেকথা অবিশ্বাস করবো কেমন করে? কেন না, বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যও তো 'প্রমাণ'। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভোল্টেয়ার লিখেছেন, পড়ন্ত আপেল দেখেই নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ভোল্টেয়ারের সাক্ষ্য কখনো মিথ্যে হতে পারে? এ প্রসঙ্গে একবার একটি বিতর্কের ঘূর্ণীতে পড়েছিলাম। সে সময় আমি যা বলেছিলাম কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি তা ভুল বুঝেছিলেন। নিঃসন্দেহে তা আমার প্রকাশভঙ্গীর দীনতা। এমনতরো ভুল পাঠক মাত্রেরই হতে পারে এ কথা ভেবে এখানে সে-সম্পর্কে আমার কিছু কৈফিয়ৎ রাখতে চাইছি, কেননা বর্তমান গ্রন্থেও কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে যার সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতার কাজ আর বিজ্ঞানীর জীবনীকারের কাজ এক নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসের সত্য আর জীবনীসাহিত্যের সত্যের মাপকাঠিও অভিন্ন নয়। সৃষ্টিশীল কোন লেখক যখন কোন মনীষীর জীবনী লেখেন তখন তা সাহিত্য হয়ে ওঠে। আর সাহিত্যে রসসৃষ্টির দায় থাকে লেখকের। কাজেই সেখানে অনেক কাল্পনিক কথা বা মিথ্যেও আসতে পারে সত্যের রূপ ধরে। কোন সাহিত্যিক যদি কল্পনার আশ্রয় করে কোন অসত্যকে সত্যের অদল দিতে পারেন, তাকে একান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন তবে তাঁকে অসত্য-ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না। সাহিত্য-রচনার পরিমণ্ডলে সমস্ত সফল সাহিত্যিকই চতুর মিথ্যেবাদী। একথা বলতে গিয়েই অন্যত্র লিখেছিলাম, 'নিপুণভাবে মিথ্যে বলতে ভোল্টেয়ারও জানতেন।' স্পষ্টতই আমি বলতে চেয়েছিলাম, ভোল্টেয়ার সুসাহিত্যিক, তাই তাঁর লেখনীর আঁচড়ে অসত্যও সত্য রূপে প্রতিভাত হতে পেরেছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কয়েকজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আমার বক্তব্যের অর্থ করেছেন এই যে, আমি বলেছি ভোল্টেয়ার মিথ্যেবাদী। সেদিন সেকথার প্রতিবাদ করিনি। প্রতিপক্ষের পাণ্ডিত্যে

শ্রদ্ধাশীল ছিলাম বলেই বুঝেছিলাম, আমার প্রকাশভঙ্গীতেই বোধকরি ত্রুটি ছিল। তাই যে-কথা সেদিন অস্পষ্টভাবে বলেছিলাম, আজ সেকথা আরো স্পষ্ট করে বলি : সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে কেবল ভোল্টেয়ারই নয়, সমস্ত সফল সাহিত্যিকই নিপুণ মিথ্যেবাদী, এমন কি, বাল্মীকি বেদব্যাস পর্যন্ত।

বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় এত কথা লিখতে হলো এজন্য যে, এ গ্রন্থের লেখক হিসেবে আমাকে একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে হয়েছে। একদিকে যেমন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসকে অবিকৃত রাখার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রসসৃষ্টির তাগিদে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছে। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গেও কিছু কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। বলা বাহুল্য এসব কিংবদন্তীর কোনটিকেই আমি অভ্রান্ত বলে মনে করি না। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কিত নানান বই পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে, একই আবিষ্কার সম্পর্কে একাধিক কিংবদন্তী চালু আছে। প্রাকৃতিক চুম্বক আবিষ্কার সম্পর্কে মেষ-পালকের যে-কিংবদন্তী আছে সে-সম্পর্কে দ্বিমত আছে। লিডেন জারের আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী হিসেবে তিনটি বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তীর উল্লেখ পেয়েছি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কিংবদন্তীকে সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলে প্রমাদ ঘটতে পারে। বর্তমান গ্রন্থে আমিও নানান কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছি বিষয়বস্তুকে সুখপাঠ্য করার তাগিদে। বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এ সব কাহিনী পাঠকদের কাছে 'রিলিফ্'-এর কাজ করবে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সেগুলোকে এ বইতে স্থান দিয়েছি। অর্থাৎ, এ গ্রন্থেও সত্যের পাচনের সঙ্গে মিথ্যের সিরাপ মিলেমিশে আছে। হ্যাঁ, মিথ্যেও বলেছি, তবে জানি না কতটা সফলভাবে বলতে পেরেছি। এ বই পড়ে যদি কোন পাঠক বা সমালোচক বর্তমান গ্রন্থকারকে 'নিপুণ মিথ্যেবাদী' আখ্যা দেন তাহলে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

পরিশেষে উত্তরকালের বিজ্ঞান-লেখকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, তাঁরা যেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের কোন কিংবদন্তীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমাকে 'বিশ্বস্ত ব্যক্তি' ভেবে না বসেন।

এ গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশনায় যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে আছেন শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা, শ্রীমনীন্দ্র ঘটক, শ্রীমিহির আচার্য, শ্রীশিশির ব্যাপারী, শ্রীস্বদেশ ঘোষ, শ্রীতাপস সাহা এবং শ্রীসমরেন্দ্র সাহা। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

অজয় চক্রবর্তী

সূচীপত্র

বিদ্যুতের ইন্দ্রজাল

"অনেক দিন আগেকার কথা। সে-সময়ে মিশরে একজন ধূর্ত জাদুকর থাকতো। আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। আগুন ছাড়াই সে ধাতু গলাতে পারতো, তেল বা অন্য কোন জ্বালানি ছাড়াই আলো জ্বালাতে পারতো। আর, একটা আশ্চর্য বাক্স ছিল তার। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে জাদুকর কথা বলতো, আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে তার সাকরেদ সে সব কথা শুনতে পেতো।..."

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা একটি বিদেশী রূপকথা এভাবে শুরু হয়েছিল। সেদিন এ গল্প ছিল রূপকথা, এ গল্প ছিল কল্পকাহিনী। কিন্তু আজ আর এ গল্পকে রূপকথা বলা চলবে না। ঐ জাদুকরকেও আজ আর বিশেষ ক্ষমতাবান বলে মনে হবে না, কেন না, জাদুকরের যে-সব ক্ষমতার কথা গল্পে বলা হয়েছে তা আজ যে কোন সাধারণ মানুষের করায়ত্ত। মানুষ আজ আগুন ছাড়াই ধাতু গলাতে পারে, জ্বালানি ছাড়াই আলো জ্বালাতে পারে, পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। যার সাহায্যে এসব ইন্দ্রজাল আজ আয়ত্তে এসেছে তার নাম 'বিদ্যুৎ'। বিদ্যুৎকে বোধ করি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আলাদিনের আজ্ঞাবহ দৈত্যটি যেমন পলকে অসাধ্য সাধন করতো, বিদ্যুৎও আজ তেমনি অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করছে। কেবল একটা সুইচ্ টিপলেই অন্ধকারের বুকে চোখ-ধাঁধানো আলো ফুটে ওঠে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বার্তা পাঠাতে হবে? বিদ্যুতের সাহায্যে আজ মুহূর্তের মধ্যেই তা সম্ভব হচ্ছে। আরব্য উপন্যাসের জীন-দৈত্যরাও বোধ করি এতো দ্রুত সে সংবাদ পৌঁছে দিতে পারতো না। হাজার আরবী ঘোড়া এক সঙ্গে বেঁধে দিয়েও সে দ্রুততার সঞ্চার করা যায় না, বিদ্যুতের টানে রেলগাড়ি, ট্রামগাড়িতে সহজেই সে দ্রুততা সঞ্চারিত হচ্ছে। বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ আজ বহু আশ্চর্যকেই বাস্তবায়িত করেছে। মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ আজ মহাকাশ থেকে বার্তা পাঠাচ্ছে। পৃথিবীতে

বসে মানুষ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। এ মুহূর্তে হয়তো লণ্ডনের কোন টেলিভিসন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একজন অধ্যাপক কোন বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর স্কটল্যাণ্ডে টেলিভিসন সেট-এর সামনে বসে কয়েকজন ছাত্র সে বক্তৃতা শুনছে, নোট নিচ্ছে। কিংবা হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, আর কোলকাতার ক্রীড়ামোদীরা তা দেখতে পাচ্ছে। এও এক রূপকথা!

মানুষ কী ভাবে এ অসম্ভবকে সম্ভব করলো, এক শতাব্দী আগেও যা ছিল কষ্ট-কল্পনার বিষয়, কী করে আজ তা বাস্তবায়িত হলো—সে ইতিহাস রূপকথার চেয়েও উপভোগ্য এবং রোমাঞ্চকর। সে ইতিহাস মানুষের অপরিসীম অনুসন্ধিৎসার ইতিহাস, অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং তিতিক্ষার ইতিহাস। মানুষ কেমন করে বিদ্যুৎ-শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখলো সে ইতিহাস, সে রূপকথা সুদীর্ঘ।

থালিস এবং তাঁর আবিষ্কার

বিদ্যুতের রূপকথা শুরু হয়েছে বহু বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে। এ গল্পের প্রথম নায়ক হলেন মাইলেটাস-এর বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ থালিস। মাইলেটাস তখন গ্রীকদের উপনিবেশ। থালিস জন্মেছিলেন যীশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে। কেবল বিদ্যুতের কথাই নয়, বিজ্ঞানের কথাও কার্যত শুরু হয়েছে থালিসের সময় থেকে। থালিস ছিলেন বহু বিষয়ে আগ্রহী। তাঁর অসাধারণত্ব সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী আছে।

শোনা যায়, থালিসের এক ব্যবসায়ী বন্ধু তাঁকে ঠাট্টা করে বলে-ছিলেন, 'অলস চিন্তা করে দার্শনিক হওয়া কঠিন নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসায়ী হওয়া তার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত।'

থালিস বলেছিলেন, 'দার্শনিকরা ইচ্ছে করলেই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে করলেই দার্শনিক হতে পারে না।'

থালিসের কথায় তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধুটি বলেছিলেন, 'বেশ তো, প্রমাণ করে দেখাও দেখি যে তুমিও ব্যবসায় সফল হতে পারো।'

থালিস এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। আমি আমার কথার প্রমাণ দেবো।'

কয়েক বছর জলপাই-এর ফলন ভাল না হওয়ায় জলপাই-তেল তৈরীর কারখানাগুলোর অবস্থা ভাল ছিল না। থালিস আবহাওয়ার অবস্থা দেখে অনুমান করলেন, সে বছর জলপাই-এর ফলন ভাল হবে। এই অনুমানের ভিত্তিতে তিনি আগে থেকে জলপাই-তেল তৈরীর সমস্ত কারখানা অল্প টাকায় ভাড়া করে রাখলেন। সে-বছর জলপাই-এর ফলন সত্যি ভাল হলো। থালিস অল্প মূল্যে জলপাই কিনে চড়া দামে জলপাই-তেল বিক্রি করে প্রচুর অর্থের মালিক হলেন এবং প্রমাণ করলেন যে, তিনি কেবল তন্ময় দার্শনিকই নন, বিষয়বুদ্ধিতেও তিনি সমান প্রখর।

থালিসের ছিল অপরিসীম কৌতূহল। নানান বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর টেবিলে সব সময়ই নানান রকম জিনিসপত্র ছড়ানো থাকতো। শীতকালের এক অপরাহ্ণে তিনি যখন টেবিলে বসে কাজ করছিলেন তখন এক টুকরো অ্যামবার দেখতে পেলেন তাঁর টেবিলের এক পাশে। অ্যামবার হলো ইষৎ হলুদ আভা-যুক্ত রেসিন। তিনি দেখলেন, কয়েকদিন অবহেলায় পড়ে থাকার ফলে সেটার গায়ে ধুলোবালির প্রলেপ পড়ে গেছে। তিনি সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য টেবিল থেকে তুলে নিয়ে তাঁর কোটের উপর ঘষতে লাগলেন। বেশ ভালভাবে ঘষার ফলে অ্যামবারের টুকরোটা তার রঙ এবং ঔজ্জ্বল্য ফিরে পেলো। থালিস খুশি হয়ে সেটাকে টেবিলের উপর রাখলেন এবং ঠিক তখনই একটা আশ্চর্য ব্যাপার থালিসের নজরে পড়লো।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখার জন্য থালিস প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনার অস্বাভাবিকত্বে তিনি এতই বিস্মিত হলেন যে, নিজের চোখকেও যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে মনে ভাবলেন, 'ঠিক দেখছি তো! নাকি এ আমার চোখের ভুল?' থালিসের টেবিলে কয়েকটা ছোট কাঠের কুচি পড়ে ছিল। থালিস লক্ষ্য করলেন যে, ঘষার পর অ্যামবারের টুকরোটাকে টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের কুচিগুলো

আপনা থেকেই অ্যামবারের টুকরোটার দিকে এগিয়ে এলো এবং সেটার গায়ে আঁটকে গেলো।

ব্যাপারটা চোখের ভুল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। থালিস আবার অ্যামবারের টুকরোটাকে হাতে তুলে নিলেন। পোশাকের উপর চেপে ভালভাবে ঘষে আবার সেটাকে কাঠের কুচিগুলোর সামনে রাখলেন। না, চোখ তাকে প্রতারিত করে নি। তিনি দেখলেন,

কাঠের কুচিগুলো লেগে আছে অ্যামবারের গায়ে। কিছুক্ষণ থালিস তাকিয়ে রইলেন দণ্ডটির দিকে

আবার সেই কাঠের কুচিগুলো অ্যামবারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলো এবং তার গায়ে আঁটকে গেলো। থালিস এবার ধীরে ধীরে অ্যামবারের টুকরোটাকে হাতে তুলে নিলেন। কাঠের কুচিগুলো অ্যামবারের গায়ে লেগে আছে। কিছুক্ষণ থালিস তাকিয়ে রইলেন দণ্ডটির দিকে। ভাবতে লাগলেন, অ্যামবার-এর টুকরোটা কি কেবল কাঠকেই আকর্ষণ করে? তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, কেবল কাঠই নয়, অ্যামবারকে কাপড় দিয়ে ঘষলে ঐ অ্যামবার ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো, পালক

এবং অন্যান্য হাল্কা বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে। অ্যামবারকে ঘষলে তবেই সেটা হাল্কা বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে, না ঘষলে অ্যামবারের সে-ক্ষমতা থাকে না।

এই আকস্মিক আবিষ্কারে থালিস অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং এর রহস্য-উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তিনি যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন তখন ম্যাগনেস নামে এক মেষপালকের কিংবদন্তীর কথা তাঁর মনে পড়লো। ম্যাগনেস ছিল ক্রেট দ্বীপের বাসিন্দা। সে তার ভেড়ার পালকে একটি পাহাড়ী অঞ্চলে চরাতো। একদিন সে তার ভেড়ার পালকে অনুসরণ করে 'মাউণ্ট ইডা' পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল। হঠাৎ ম্যাগনেস দেখলো যে, সে আর পা তুলতে পারছে না। 'কী হলো?' ম্যাগনেস ভাবলো। লক্ষ্য করে দেখলো যে, তার লোহার নাল-লাগানো জুতো দুটো পাহাড়ের গায়ে শক্তভাবে এঁটে গেছে। যথেষ্ট জোরে না টেনে জুতো দুটোকে পাহাড়ের গা থেকে তোলা যাচ্ছে না।

ম্যাগনেসের এ অসুবিধের মূলে ছিল 'লোডস্টোন' নামে একরকমের পাথর। এ পাথরের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—এ পাথর লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে। তোমরা সকলেই নিশ্চয় চুম্বক দেখেছ এবং এও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, চুম্বক লোহার তৈরী পিন, সূঁচ ইত্যাদি বস্তুকে আকর্ষণ করে। লোডস্টোন হলো প্রাকৃতিক চুম্বক; পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ পাথর পাওয়া যায়। লোডস্টোন মানুষের তৈরী কৃত্রিম চুম্বকের মতোই ক্রিয়া করে।

থালিস লোডস্টোন-সম্পর্কে জানতেন। গ্রীকরা ম্যাগনেস-এর নামানুসারে এ পাথরের নাম দিয়েছিলেন 'ম্যাগনেটাইট'। প্রকৃতপক্ষে, 'চুম্বক' শব্দটার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ম্যাগনেট' কথাটাও এসেছে ম্যাগনেস-এর নাম থেকে। থালিস এও জানতেন যে, ম্যাগনেটাইটকে না ঘষলেও তা লোহাকে আকর্ষণ করে। অ্যামবারের সঙ্গে লোডস্টোনের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো এই যে, অ্যামবারকে ঘষলে তবেই তা অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে। থালিস ভাবতে লাগলেন, 'ম্যাগনেটাইটের আকর্ষণ-ক্ষমতার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে অ্যামবারে সঞ্চারিত আকর্ষণ-ক্ষমতার কী কোন সম্পর্ক আছে?' এ প্রশ্নের জবাব তিনি

খুঁজে পান নি। তিনি অনুমান করেছিলেন যে, অ্যামবারের আকর্ষণ-ক্ষমতাও এক ধরনের চুম্বকত্ব। ঘর্ষণের ফলে অ্যামবারের এই আকর্ষণ-ক্ষমতা-লাভের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে না পারলেও থালিস তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলো যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। থালিস যখন এ আবিষ্কার করেন তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান আবিষ্কার করেছেন এবং তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছেন।

ডাঃ গিলবার্টের অবদান

বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। থালিসের পর বহু দার্শনিক চুম্বকত্ব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, চিন্তা করেছেন অ্যামবারের এই আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে। কিন্তু দু'হাজার বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলো না। এর পর তড়িৎ-বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদান রাখেন ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ-এর চিকিৎসক স্যার উইলিয়ম গিলবার্ট।

১৬০০ খ্রীস্টাব্দ। একদিন ডাঃ গিলবার্ট বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন। রানীর প্রাসাদ থেকে জরুরী তলব এসেছে। রানীর শরীর ভাল নেই, তাঁকে দেখতে যেতে হবে। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। কড়া নাড়তেই ডাঃ গিলবার্ট দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুকের এক হাতে একটা প্যাকেট, অন্য হাতে একখানা চিঠি। আগন্তুক চিঠিটা এগিয়ে দিল ডাঃ গিলবার্টের দিকে, চিঠিতে চোখ বুলিয়ে পত্রবাহক কার কাছ থেকে আসছে বুঝতে পেরেই ডাঃ গিলবার্ট অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি আগন্তুকের হাতের প্যাকেটটা এক রকম ছিনিয়ে নিলেন। তারপর কোন রকমে দায়সারা ভাবে 'থ্যাঙ্ক ইউ' কথাটা উচ্চারণ করে প্যাকেটটা নিয়ে দ্রুত তাঁর পড়ার ঘরের দিকে

ছুটলেন। ডাঃ গিলবার্টের এই অদ্ভুত ব্যবহারে আগন্তুক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো; তারপর ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। মনে মনে বললো, 'উঃ, কী অভদ্র!'

ডাঃ গিলবার্টের তখন ভদ্রতাবোধ থাকার কথা নয়। প্যাকেটটা হাতে পেয়ে তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। রানীকে দেখার জন্য যে তাঁর তক্ষুনি রানীর প্রাসাদে যাবার কথা তাও তিনি বিস্মৃত হলেন। আগন্তুক যে-প্যাকেটটা বয়ে এনেছিল তাতে ছিল ডাঃ গিলবার্টের লেখা 'ড্য মাগনেট' (De Magnete) বই-এর একটা কপি। তাঁর দীর্ঘ সতের বৎসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভাবনা-চিন্তার ফসলকে তিনি একটি স্থায়ী রূপ দিয়েছেন এ বইটিতে। চুম্বক সম্পর্কে তিনি যা-কিছু আবিষ্কার করেছেন তার সবকিছুই তিনি এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বইটা হাতে নিয়ে ডাঃ গিলবার্টের নানান কথা মনে পড়লো। ছোট-বেলায় তিনি মাগনেস এবং থালিসের আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। এঁদের কাহিনী শুনে চুম্বকত্ব-সম্পর্কে গিলবার্ট অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন, এ বিষয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। এরপর দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে তিনি বহু নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কেবল অ্যামবারই নয়, ঘর্ষণের ফলে গন্ধক, কাচ, মোম ইত্যাদি পদার্থও হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে। তিনি আরও দেখলেন যে, কতকগুলো পদার্থ আছে ঘর্ষণের ফলে যাদের মধ্যে কখনোই আকর্ষণ-ক্ষমতার উদ্ভব ঘটতে দেখা যায় না। লোহার প্রতি ম্যাগনেটের আকর্ষণের সঙ্গে অ্যামবারের ঘর্ষণজাত আকর্ষণ-ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষ্য করে তিনি অ্যামবারের এই আকর্ষণ-ক্ষমতার নাম দিয়েছিলেন—'ইলেকট্রিসিটি' (electricity)। অ্যামবারকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'ইলেকট্রা' (elektra)। এ শব্দ থেকেই ডাঃ গিলবার্ট 'ইলেকট্রিসিটি' শব্দটি তৈরী করে নেন। বাংলায় এর প্রতিশব্দ হলো 'বিদ্যুৎ' বা 'তড়িৎ'।

ডাঃ গিলবার্ট নানান পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের শ্রেণীবিভাগ করেন। ঘর্ষণের ফলে কোন্ পদার্থে আকর্ষণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়, কোন্ পদার্থে তা হয় না, তারও একটি তালিকা তিনি তৈরী

করেছিলেন। সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করার উদ্দেশ্যে তিনি 'ইলেকট্রোস্কোপ' নামে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। যন্ত্রটি ছিল অত্যন্ত সরল। এতে একটি শুকনো খড় ঝোলানো ছিল। ডাঃ গিলবার্ট বিভিন্ন পদার্থকে ঘষে ঐ খড়ের সামনে ধরতেন। খড়ের টুকরোটা আকৃষ্ট হচ্ছে কিনা, হলে কতোটা হচ্ছে ডাঃ গিলবার্ট সেসব লক্ষ্য করেন এবং সে সব পরীক্ষার ফলাফল যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেন। ঘর্ষণজাত আকর্ষণের কারণ কী ডাঃ গিলবার্ট তা জানতে পারেন নি। কিন্তু এসব নিয়ে তাঁর সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিদ্যুৎ সম্পর্কে বহু আবিষ্কারের পথ তৈরী করে দিয়েছিল।
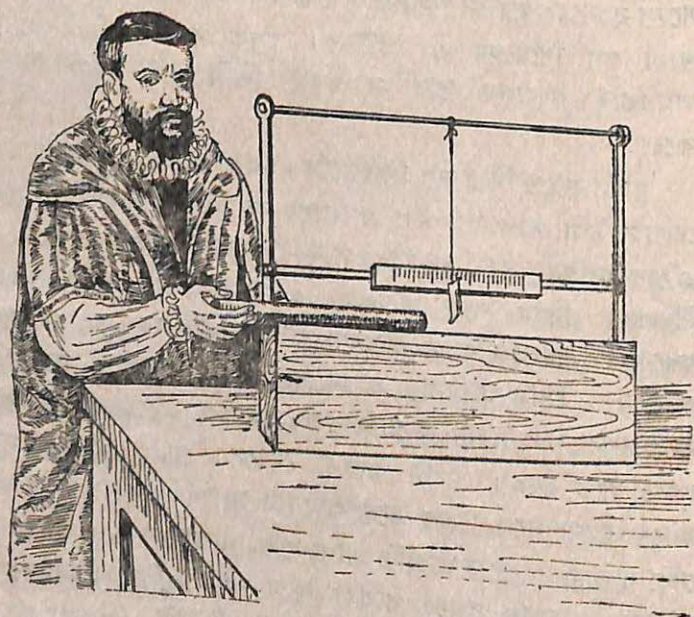
ডাঃ গিলবার্ট এবং তাঁর উদ্ভাবিত ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্র

ডাঃ গিলবার্ট যখন তাঁর লেখা 'দ্য ম্যাগনেট' বইটার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন তখন তিনি অনুমানও করতে পারেন নি যে, তাঁর এ বই বিজ্ঞানী মহলে কী গভীর মতানৈক্যের সৃষ্টি করবে। তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি যে পরবর্তী কালে 'তড়িৎ-বিজ্ঞানের জনক' বলে পরিচিত হবেন এ কথাও সেদিন তিনি ভাবতে পারেন নি।

বার্গোমাস্টার অটো ফন গেরিক এবং তাঁর গবেষণা

'ইলেকট্রিসিটি' সম্পর্কে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত যা জানা ছিল তাঁর সবটুকুই ডাঃ গিলবার্টের 'দ্য ম্যাগনেট' বইটিতে লিপিবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে এ বইটি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর হাতে পৌঁছে গেল। বহু বিজ্ঞানী এ বই-সম্পর্কে বিরূপ ছিলেন, কেননা কোন নতুন তত্ত্ব বা নতুন ধারণা গ্রহণের ঔদার্য তাঁদের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা যা বলে গেছেন তার সত্যতাকে তাঁরা প্রশ্নাতীত বলে মনে করতেন। কাজেই, নতুন মতবাদকে তাঁরা স্বাগত জানাতে পারেন নি।

কিন্তু কয়েকজন বিজ্ঞানী এ বইটি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন এবং ডাঃ গিলবার্টের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'একজন ঘর্ষণের ফলে পদার্থে এই রহস্যজনক আকর্ষণ-ক্ষমতা সঞ্চারিত হওয়া সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিলবার্টের বইটি প্রকাশিত হবার যাট বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয় নি। ডাঃ গিলবার্টের পরে তড়িৎ-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন অটো ফন গেরিক নামে জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী।

অটো ফন গেরিক ছিলেন জার্মানীর মাগডেবুর্গ শহরের বার্গোমাস্টার বা মেয়র। শাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন, কিন্তু তিনি ততোধিক দক্ষ ছিলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। শহরের মেয়রের দায়িত্ব পালন করেও অটো ফন গেরিক যথেষ্ট সময় পেতেন এবং তিনি সে সময় কাটাতেন নানান ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায়।

মাগডেবুর্গের বাসিন্দারা অটো ফন গেরিককে সন্দেহের চোখে দেখতো। তারা মনে করতো যে, অটো ফন গেরিক ডাকিনীবিদ্যার চর্চা

করেন এবং শয়তানের সঙ্গে তাঁর যোগসাজস আছে। মেয়রকে রাস্তায় দেখলে অনেকে রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশে চলে যেতো। কেউ কেউ তাঁকে উন্মাদ বলে মনে করতো। যে-দিন অটো ফন গেরিক ঘোষণা করলেন যে, তিনি এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন যার সাহায্যে শূন্যতা সৃষ্টি করা যায়, সেদিন ম্যাগডে-বুর্গের বাসিন্দাদের মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে, তাঁদের মেয়রের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

বিজ্ঞানী অটো ফন গেরিক

শূন্যতা সৃষ্টি করা? কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনো এমন অবাস্তব কল্পনা করতে পারে? কোন পাত্র থেকে সমস্ত বায়ু বের করে নেওয়া কখনো সম্ভব? মহামতি অ্যারিস্টটল বলে গেছেন, 'প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে' (Nature abhors vacuum)। ফন গেরিক কি তবে অ্যারিস্টটলকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে চান? পাগল ছাড়া এমন ধৃষ্টতা আর কার হতে পারে?

অটো ফন গেরিক অবশ্য এসব সমালোচনাকে আদৌ আমল দিতেন না। এ সমালোচনা বন্ধ করার ব্যাপারেও তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তাই তাঁকে ঘিরে নানান জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো এবং নানান গুজব ছড়াতে লাগলো। সম্রাট তৃতীয় ফার্দিনান্দের কানেও একদিন গিয়ে সে-কথা পৌঁছোলো। তিনি এসব গুজবের সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে অটো ফন গেরিককে একটি জরুরী বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, দু'সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মাগডেবুর্গ শহর পরিদর্শনে আসছেন। চিঠিতে সম্রাট আরো লিখেছিলেন, 'আমি লোকমুখে শুনেছি আপনি ঘোষণা করেছেন যে, আপনি শূন্যতা সৃষ্টি করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আপনার এ দাবীর সত্যতা আশা করি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন।'

মেয়রের পদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এ পদে আসীন ব্যক্তির প্রতি

শহরবাসীদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কাজেই সম্রাট ফার্দিনান্দ অটো ফন গেরিকের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

সম্রাটের কাছ থেকে বার্তা পেয়ে ফন গেরিক স্বাভাবিকভাবেই একটু চিন্তিত হলেন। পরবর্তী দু'সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সম্রাটকে তুষ্ট করার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। যেদিন সম্রাট ফার্দিনান্দ মাগডেবুর্গ শহরে এসে পৌঁছোলেন সেদিনটি ছিল আলো-ঝলমলে। মাগডেবুর্গ শহরের সমস্ত পথঘাট নানান বর্ণে সজ্জিত করা হয়েছিল। সর্বত্র ছিল নানান বাহারী ফুলের মেলা। শহরবাসীরাও সেদিন যেন উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো। প্রত্যেকেই তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালো সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানাতে, স্বাগত জানাতে।

মেয়র মাগডেবুর্গ শহরের 'সিটি হল'-এ সম্রাট এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, খানাপিনার ব্যবস্থাও ছিল বিপুল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর অটো ফন গেরিক উঠে দাঁড়ালেন এবং বিনা ভূমিকায় ঘোষণা করলেন, 'এর পর আমি আমার নতুন বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের ক্রিয়া আপনাদের দেখাবো। একটি ফাঁপা গোলকের ভেতর থেকে আমি বায়ু বের করে দিয়ে তাতে শূন্যতা সৃষ্টি করবো।'

হলের মধ্যে হাসির রোল উঠলো। সম্রাট ফার্দিনান্দও সন্দিগ্ধ চোখে মেয়রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, মেয়র কি করে এই অস্বাভাবিক দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন?

সম্রাটের সঙ্গীদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বলে উঠলো, 'গোলকের ভেতরের শূন্যতা দেখার জন্য উঁকি দেবার ব্যবস্থা থাকবে তো?' আবার হাসির রোল উঠলো হল ঘরে। সম্রাটও হাসি চাপতে পারলেন না। কিন্তু অটো ফন গেরিক সমস্ত হাসিঠাট্টা উপেক্ষা করে শুধু বললেন, 'এখান থেকে কিছুটা দূরে একটা বড়ো মাঠে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে। চলুন, আমরা সেখানে যাই।'

মেয়রের সঙ্গে সম্রাট এগিয়ে চললেন সেই মাঠের দিকে। তাঁর পেছনে মিছিল করে এগিয়ে চললো বাকি সবাই। সম্রাট ফার্দিনান্দ মাঠে এসে একটা বড়ো চেয়ারের উপর বসলেন। শহরবাসীরা তাঁর দু'পাশে জড়ো হলো। এর পর মেয়র তাঁর প্রদর্শনী শুরু করলেন। তিনি তামার তৈরী দুটো অর্ধগোলক নিয়েছিলেন। তিনি দেখালেন

যে, অর্ধগোলক দুটোকে মুখোমুখি এঁটে একটি গোলক তৈরী করা যায়। প্রতিটি অর্ধগোলকের সঙ্গে একটি ধাতব আংটা লাগানো ছিল। ফন গেরিক কয়েকবার অর্ধগোলক দুটোকে পরস্পরের সঙ্গে এঁটে একটি গোলক তৈরী করলেন এবং এর পরই দুপাশ থেকে টেনে অর্ধগোলক দুটোকে পৃথক করে দেখালেন যে, অর্ধগোলক দুটোকে পৃথক করা আদৌ শক্ত নয়।

এর পর তিনি তাঁর বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পটি আনলেন। যন্ত্রটি আদৌ দৃষ্টিনন্দন ছিল না। এতে ছিল একটি ধাতব ব্যারেল। এই ব্যারেলের এক পাশে একটি নল যুক্ত ছিল এবং অন্য পাশ থেকে বেরিয়ে ছিল একটি হাতল।

তিনি আবার অর্ধগোলক দুটোকে মুখোমুখি এঁটে একটি গোলক তৈরী করলেন এবং এই গোলকের সঙ্গে লাগান ভাল্‌ভের সাহায্যে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের নলটিকে গোলকটির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। এর পর সম্রাট এবং অন্যান্য দর্শকের দিকে তাকিয়ে ফন গেরিক বললেন, 'এবার আমি গোলকটির ভেতর থেকে বায়ু বের করে নেবো।'

দর্শকরা নীরবে তাঁর কার্যকলাপ দেখছিল। তাঁর কথা শুনে দর্শকদের মনে হচ্ছিল যেন এক জাদুকর তাদের ভোজবাজি দেখাবে বলে ঘোষণা করছে। কিন্তু মেয়র কি শেষ অব্দি সম্রাটকে সন্তুষ্ট করতে পারবে ?

ফন গেরিক তাঁর উদ্ভাবিত পাম্পটিকে গোলকের সঙ্গে লাগিয়ে হাতলটিকে পর্যায়ক্রমে দ্রুত ওঠানামা করাচ্ছিলেন ; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-দ্রুততা কমে এলো। মেয়রের দেহের অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, হাতলটা চালু রাখতে বেশ জোর দিতে হচ্ছে। এক সময় ফন গেরিক হাতলটাকে আর টেনে তুলতে পারলেন না।

মেয়রের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। কপাল থেকে ঘাম মুছে নিয়ে তিনি সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুজুর, আমি গোলকের ভেতরকার সমস্ত বায়ু বের করে দিয়েছি। ফলে গোলকের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।'

তারপর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমার এক অতিথি জানতে চেয়েছিলেন গোলকের ভেতরকার শূন্যতা দেখার জন্য কোন উঁকি দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা। উঁকি দেবার ব্যবস্থা

থাকলেও তিনি বিশেষ-কিছু দেখতে পেতেন না, কেন না, সব কিছুই চর্ম-চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। চোখ দিয়ে মানুষ যা দেখতে পায় তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায় বুদ্ধি আর যুক্তির আলোয়।'

এর পর তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'গোলকের ভেতরে এবং বাইরে—দু'দিকেই যখন বায়ু ছিল তখন এর দুপাশেই বায়ুর চাপ সমান ভাবে ক্রিয়া করছিল এবং পরস্পরের ক্রিয়া নাকচ করে দিচ্ছিল। ফলে আংটা দুটো ধরে টেনে গোলকের দুই অর্ধাংশকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন আর গোলকের মধ্যে বায়ু নেই। এ অবস্থায় গোলকের ভেতরে কোন চাপ নেই। ফলে বাইরের বায়ুর চাপ অর্ধগোলক দুটোকে পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরবে। কাজেই, এবার আর অর্ধগোলক দুটোকে আলাদা করা সহজ হবে না।'

এর পর ফন গেরিক এক পাশের আংটা ধরে গোলকটাকে তুলে নিলেন। তারপর বার বার ঝাঁকিয়ে অর্ধগোলক দুটোকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করলেন। সবাই আশা করছিল যে, অর্ধগোলক দুটো পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু না। বার বার ঝাঁকুনি দেওয়া সত্ত্বেও অর্ধগোলক দুটো একে অন্যের সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে রইলো। এর পর মেয়র সম্রাটকে অনুরোধ করে বললেন, 'হুজুর, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, অর্ধগোলক দুটোকে আলাদা করতে পারেন কিনা।'

ফার্দিনান্দ চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন। ফন গেরিক গোলকটা বাড়িয়ে দিলেন সম্রাটের দিকে। সম্রাট গোলকটির দুই আংটা দু'হাতে ধরে টান দিলেন, কিন্তু অর্ধগোলক দুটো আল্‌গা হলো না। ফার্দিনান্দ ছিলেন বেশ বলবান। তিনিও অর্ধগোলক দুটোকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না দেখে দর্শকেরা খুবই বিস্মিত হলো।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনো আরো অনেক কিছু বাকি ছিল। ফন গেরিক এবার একটা ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারটি শক্তিশালী ঘোড়াকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। গোলকের দু'পাশের আংটার সঙ্গে দুটো করে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হলো। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়লো। দু'জোড়া ঘোড়া গোলকটিকে দু'দিকে টানতে লাগলো। কিন্তু তাতেও অর্ধগোলক দুটো আলাদা হলো না। মেয়রের ইঙ্গিতে আরো চারটে ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। এবার গোলকের উভয় দিকে চারটে করে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হলো। চারটে করে ঘোড়া দু পাশ থেকে

টেনেও কিন্তু গোলকের দুই অর্ধ বিচ্ছিন্ন করতে পারলো না। এর পর গোলকের দু'পাশে আরো ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত

বিজ্ঞানী অটো ফন গেরিক তাঁর উদ্ভাবিত বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্রের ক্রিয়া প্রদর্শন করছেন

গোলকের দু'পাশে আটটা করে ঘোড়া লাগানো হলো। তখন এক সময় এক বিকট শব্দ করে অর্ধগোলক দুটো আলাদা হয়ে গেল। অর্ধগোলক দুটোকে বিচ্ছিন্ন করতে মোট ষোলটি ঘোড়ার দরকার হয়েছিল।

অটো ফন গেরিকের এ পরীক্ষা দেখে সম্রাট ফার্দিনান্দের মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হলো। তিনি বুঝলেন যে, মেয়র যে-দাবি করেছিলেন তাতে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। ফন গেরিক সত্যিই শূন্যতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। সম্রাট ফার্দিনান্দ ভেবেছিলেন যে, মেয়রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবিগুলো ভিত্তিহীন। তিনি এও ঠিক করে-ছিলেন যে, মেয়রকে তিনি তিরস্কার করবেন এবং তাঁর উদ্ভট বৈজ্ঞানিকতার ভান ছেড়ে দিয়ে ভালভাবে শহর শাসন করতে বলবেন। কিন্তু অটো ফন গেরিকের এই পরীক্ষা দেখে ফার্দিনান্দ তাঁকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিলেন। সম্রাট আরও বললেন, 'ভবিষ্যতে যদি এমনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন তা হলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আমি আপনার বৈজ্ঞানিক জীবনের নতুন নতুন সাফল্য দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবো।'

এটি ছিল ফন গেরিকের জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। বিদ্যুতের

কাহিনীতেও এ ঘটনার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর পর থেকে ফন গেরিকের পক্ষে তাঁর ইচ্ছেমতো বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ায় আর কোন বাধা রইলো না। এখন আর কেউ তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে না, বরং সবাই তাঁকে বড়ো বিজ্ঞানী বলে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে।

ফন গেরিক এক মুহূর্তও নষ্ট করলেন না। স্বাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েই তিনি 'ইলেকট্রিসিটি' বা 'বিদ্যুৎ' নিয়ে গবেষণা করা স্থির করলেন। তিনি ডাঃ গিলবার্টের 'দ্য মাগনেট' বইটি খুঁটিয়ে পড়ে ফেললেন। ডাঃ গিলবার্টের কয়েকটি পরীক্ষা নিজের হাতে করে দেখলেন এবং এর পর নিজের কয়েকটি ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

ফন গেরিক দেখলেন যে, কোন অ্যামবার বা কাচকে পশম বা কাপড় দিয়ে ঘষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা খুবই বিরক্তিকর এবং ক্লান্তিকর। এ ছাড়া, এ পদ্ধতিতে খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎই পাওয়া যায়। কাজেই তিনি নানান ধরনের পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হলেন যার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে।

ফন গেরিক গন্ধকের একটি বল তৈরী করলেন। এর পর তিনি বলটির মধ্য দিয়ে একটি ছিদ্র করে একটি ধাতুদণ্ডকে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। এর পর তিনি দণ্ডটিকে একটা হাতলের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন যাতে হাতলটা ধরে ঘোরালে দণ্ডের সঙ্গে গন্ধকের বলটিও ঘোরে। ফন গেরিক দেখলেন যে, হাতলের সাহায্যে গন্ধকের বলটি ঘুরিয়ে ঘূর্ণমান বলটিতে দস্তানা-পরা হাত রাখলে এতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এ বিদ্যুৎ গন্ধকের বল-এ স্থির থাকে বলে ফন গেরিক একে 'স্থির বিদ্যুৎ' আখ্যা দিয়েছিলেন। ফন গেরিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলে এ যন্ত্রকে 'স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র' বলা হয়। ফন গেরিক দেখলেন যে, বিদ্যুদ্‌গ্রস্ত অবস্থায় গন্ধকের বলটি কাগজ, কাঠের কুচি, পাতলা ধাতুর পাত, পালক ইত্যাদি পদার্থকে আকর্ষণ করে।

স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্রই ফন গেরিকের বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার নয়। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে, বিদ্যুৎকে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত করা যায়। তিনি

লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোন ধাতব পাত তড়িদ্‌গ্রস্ত গন্ধকের বল-এর সংস্পর্শে এলে ঐ ধাতব পাতটি অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে। ফন গেরিক নানান বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলেন যে, তড়িদ্‌গ্রস্ত বস্তুর সংস্পর্শে এসে অন্য বস্তু তড়িদ্‌গ্রস্ত হতে পারে, অর্থাৎ, তড়িৎ-শক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হতে পারে। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার আগে বিদ্যুতের রহস্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান সূত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের প্রকৃতি সম্পর্কে তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। এ বিদ্যুৎ-ই যে একদিন অনেক আপাত-অসম্ভব কল্পনাকে বাস্তবায়িত করবে এবং মানব-সভ্যতার রূপ বদলে দেবে, তা তখনও কেউ ভাবতে পারে নি।

স্টিফেন গ্রে এবং তাঁর গবেষণা

অটো ফন গেরিক তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁর মূল্যবান অবদান রেখে একদিন মারা গেলেন। তাঁর তৈরী স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র পরবর্তী গবেষকদের কাজের সুবিধে করে দিয়েছিল, কেননা, এ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই যথেষ্ট পরিমাণ স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে। ফন গেরিকের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর ইংল্যাণ্ডে তড়িৎ-বিজ্ঞানের আর একটি মূল্যবান আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছিল। আবিষ্কর্তার নাম স্টিফেন গ্রে।

বিজ্ঞানী স্টিফেন গ্রে থাকতেন লণ্ডনের এক নিম্নবিত্ত এলাকায়। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র। তিনি পেনসন হিসেবে যে অর্থ পেতেন তাতে তাঁর খাওয়া-পরাই ভালভাবে চলতো না। কাজেই, তড়িৎ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বইপত্র কেনা ছিল তাঁর

সাধ্যাতীত, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বন্ধু গ্রেনভিল হোয়েলারের আর্থিক সাহায্য না পেলে বিজ্ঞানী গ্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারতেন না। মিঃ হোয়েলার ছিলেন বিত্তবান। লণ্ডনের ওটারডেন প্লেস-এর একটি সুন্দর বাড়িতে তিনি বাস করতেন। বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে—বিশেষ করে তড়িৎ সম্পর্কে তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল। বন্ধু স্টিফেন গ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। আর্থিক সাহায্য পেলে তাঁর বন্ধু স্টিফেন যে বড়ো রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন তিনি তা গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন।

মিঃ হোয়েলার একদিন রাত্রে অপেরা দেখে ফিরছিলেন। রাস্তায় আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল বন্ধু স্টিফেনের সঙ্গে। বন্ধুকে বিমর্ষ দেখে মিঃ হোয়েলার হাল্কা সুরে বললেন, 'কী ব্যাপার, স্টিফেন? এমন গোমড়া মুখ করে আছো কেন? দাঁতে ব্যথা হয়েছে নাকি?'

—'গ্রেনভিল, দাঁতের ব্যথা হলে দাঁতগুলো উপড়ে ফেলা যায়। কিন্তু যন্ত্রণা যখন হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে, যখন আত্মা দগ্ধ হতে থাকে তখন মানুষ কী করতে পারে?'

স্টিফেনের কথাগুলো গ্রেনভিল ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, তার বন্ধুর মন ভারাক্রান্ত এবং তার এখন একজন শ্রোতা দরকার যার কাছে তাঁর যন্ত্রণার কথাগুলো বলে মনকে হালকা করতে পারবেন। গ্রেনভিল বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার বাড়ি চলো। সেখানে বসেই তোমার সব কথা শুনবো।'

গ্রেনভিল তার বন্ধু স্টিফেনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গ্রেনভিল জানতে চাইলেন, 'স্টিফেন, তুমি হঠাৎ এমন ভেঙে পড়েছ কেন? তোমার মধ্যে মনোবলের অভাব তো আগে কখনো দেখি নি!'

স্টিফেন বললেন, 'তুমি তো জানো, গ্রেনভিল, আমি কোন দিন অর্থবান হতে চাই নি। প্রতিষ্ঠা বা সামাজিক প্রতিপত্তির পেছনেও ছুটি নি। আমি শুধু একান্তে বসে দুনিয়ার স্বরূপটা বুঝার চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে নতুন সত্যের সন্ধান করতে চেয়েছিলাম যে-সত্য হয়তো সমস্ত মানবজাতির ইতিহাস বদলে দিতে পারে। কিন্তু যে দরিদ্র তার কোন আশাই বাস্তবায়িত হতে পারে না।'

—'স্টিফেন, তোমার পরিকল্পনাটা আমায় খুলে বলো। আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

—'ইচ্ছে ছিল বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করা। এ এক আশ্চর্য শক্তি। এর স্বরূপ জানা আজও সম্ভব হয় নি। কিন্তু গ্রেনভিল, আমার কেবলই মনে হয় বিদ্যুৎ একদিন অসাধ্য সাধন করবে। মনে হয়, বিদ্যুতের স্বরূপ জানতে পারলেই বিশ্বের স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

—'বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমারও কৌতূহল আছে, স্টিফেন। আমিও বিদ্যুৎ সম্পর্কে জানতে চাই। আমার অর্থের জোর আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের জোর নেই। থাকলে হয়তো নিজেই একটা পরীক্ষাগার গড়ে তুলতাম। তোমার পরিকল্পনা শুনে আমার ভাল লাগছে। এজন্য ভাল লাগছে যে, তোমার এ পরিকল্পনার মধ্যে আমি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। কাজেই, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমায়। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তা হলে আমার বাড়িতেই তোমার জন্য একটা পরীক্ষাগার তৈরী করে দিচ্ছি। অবশ্য, আমার একটা শর্ত আছে। আমাকে তোমার সহকারী করে নিতে হবে। বলো, রাজি আছো কি না।'

আনন্দে স্টিফেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'সত্যি বলছো, গ্রেনভিল ?' গ্রেনভিল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ স্টিফেন। মনে করো না যে, আমি বিনা স্বার্থে অর্থব্যয় করছি। তোমার উপর আমার আস্থা আছে। আমার মন বলছে, সুযোগ পেলে তুমি মূল্যবান অবদান রেখে যেতে পারবে। তখন তোমার সহকারী হিসেবে আমার নামটাও হয়তো উচ্চারিত হবে। এ আশাতেই আমি তোমার গবেষণার ব্যয় বহন করবো।'

কয়েক মাস পরের কথা। দুই বন্ধু গবেষণাগারে বসে কাজ করছে। গবেষণাগার তো নয়, যেন মাকড়সার জাল। সারা ঘরে সূতোর জাল পাতা রয়েছে যেন। একটা লম্বা সূতোকে কয়েকখানা হুকের সাহায্যে দুই বিপরীত দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। দুই বন্ধু ঘরের দুই কোণায় বসে আছে। স্টিফেনের হাতে একটা কাচের দণ্ড। কাচের দণ্ডটার মাথায় সূতোর একপ্রান্ত জড়ানো আছে। সূতোর অন্য প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত আছে একটা আইভরি বল। গ্রেনভিল তার পাশেই বসে

আছে, তার হাতে একটা বোর্ড। ঐ বোর্ডটির উপর কয়েকটা হালকা পালক রাখা আছে।

স্টিফেন একটা রেশমী কাপড় দিয়ে কাচের দণ্ডটা ঘষে বন্ধুকে বললেন, 'গ্রেনভিল, পালকগুলো বলটার সামনে ধরো।'
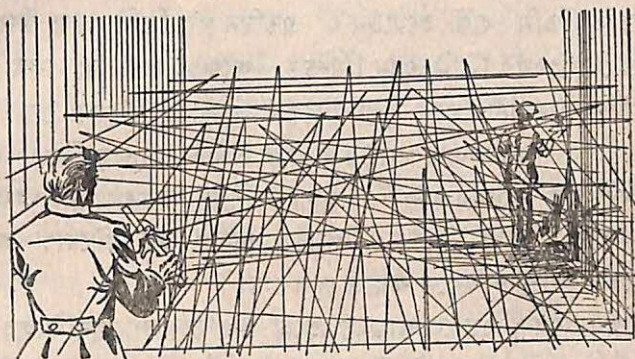
গবেষণাগার তো নয়, যেন মাকড়সার জাল

গ্রেনভিল বন্ধুর কথামতো পালকগুলোকে ধরলেন আইভরি বলের সামনে। কিন্তু না ; যা আশা করা গিয়েছিল তা হলো না।

গ্রেনভিল নীরব।

স্টিফেন অধৈর্য হয়ে জানতে চায়, 'কিছু হচ্ছে?'

গ্রেনভিল বললেন, 'নাঃ'।

স্টিফেন আরো জোরে কাচের দণ্ডটাকে ঘষতে লাগলেন। কিন্তু না, তাতেও কোন কাজ হলো না। স্টিফেন হতাশ হয়ে বললেন, 'গ্রেনভিল, না হওয়ার তো কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না! তা হলে?'

গ্রেনভিল হেসে বললেন, 'বন্ধু, সাফল্য কি এতো সহজে আসে? ধৈর্য হারিও না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, গোলমালটা কোথায় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। আজ আর নয়। এখন চলো, টেমসের ধারে গিয়ে বসি।'

১৭২৯ খ্রীস্টাব্দ। শীতের রাত। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং কুয়াশা। এরই মধ্যে স্টিফেন গ্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ওটারডেন প্লেসের উদ্দেশ্যে। ওভারকোটের কলারটা তুলে কানটা ঢেকে নিলেন গ্রে। বগলে একটা পার্সেল। রাস্তার

কোন কোলাহলই গ্রের কানে ঢুকছে না। তিনি তন্ময় হয়ে পথ চলছেন আর সে-রাতের জন্য পরিকল্পিত পরীক্ষার খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবছিলেন। কয়েকমাস ধরে তিনি লম্বা সূতোর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানোর চেষ্টা করেছেন; কিন্তু যতবারই সে-চেষ্টা করেছেন ততবারই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এতদিন পর তিনি আজ তাঁর ভুলটা ধরতে পেরেছেন। তিনি এখন নিশ্চিত—আজকের পরীক্ষা সফল হবেই।

নিজের ভাবনার বৃত্তে ডুবে ছিলেন বিজ্ঞানী স্টিফেন গ্রে। হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে এবং গাড়ির চাকার বিকট ঘড়্-ঘড়ানিতে বাইরের জগৎ-সম্পর্কে সচেতন হলেন। মুহূর্তে বিপদ্ বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে সরে গেলেন রাস্তা থেকে। গাড়ির চালক এই নির্বোধ অন্যমনস্ক পথচারীর মুণ্ডুপাত করতে করতে চলে গেল।

গ্রে বুঝলেন, এভাবে আত্মমগ্ন হয়ে পথ চললে গ্রেনভিলের গাড়ি বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই তিনি কফিনে পৌঁছে যাবেন। তিনি এবার সতর্ক হলেন। বগলের প্যাকেটটা আগের চেয়ে জোরে চেপে ধরে দ্রুত হেঁটে ওটারডেন প্লেস-এ পৌঁছে গেলেন।

হোয়েলার দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আগে ফায়ার প্লেস-এর সামনে বসে শরীরটা গরম করে নাও।'

কিন্তু গ্রে তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এতোই উত্তেজিত যে, বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করলেন না। এখন তাঁর আরাম করার সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর ধারণাটা যাচাই করে দেখতে হবে। বন্ধুকে বললেন, 'গ্রেনভিল, আমি সমস্যাটার সমাধান পেয়ে গেছি। আগের পরীক্ষাগুলোতে একটা মারাত্মক ভুল থেকে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত —আজকের পরীক্ষা সফল হবেই। এসো, আমায় সাহায্য করবে।'

দুই বন্ধু উত্তেজিতভাবে তাঁদের গবেষণাগারে গিয়ে ঢুকলেন! গ্রে তাঁর বগলের প্যাকেটটা খুলে সূতোর একটা মোটা রিল এবং একটি আইভরি বল বের করলেন্। তারপর হোয়েলারের সাহায্যে তিনি সুদীর্ঘ একখণ্ড সূতোকে বার বার এপাশ-ওপাশ করে দুই দেওয়ালের মধ্যে আটকে দিলেন্। সারা ঘর জুড়ে সূতোর গোলোক-ধাঁধা।

এর পর সূতোর এক প্রান্তে আইভরি বল এবং অন্য প্রান্তে কাচের দণ্ডটা লাগানো হলো। দেওয়ালের যেখানে যেখানে সূতোটা আটকানো ছিল সে জায়গাগুলো ভালভাবে দেখে নিয়ে গ্রে বললো,

'গ্রেনভিল, সব ঠিক আছে। এবার পালকগুলো আইভরি বলের সামনে ধরো।'

গ্রের কথামতো হোয়েলার পালকগুলোকে আইভরি বলের সামনে ধরলেন। গ্রে একখণ্ড কাপড় দিয়ে কাচের দণ্ডটাকে ঘষতে লাগলেন। প্রায় তখনই হোয়েলার চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টিফেন, তুমি বাজি মাৎ করেছ! পালকগুলো লাফিয়ে উঠে আইভরি বলের সঙ্গে আটকে গেছে।'

হোয়েলারের এই কথায় তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিরাট সাফল্য ঘোষিত হলো। এই প্রথম বিদ্যুৎকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত করা সম্ভবপর হলো। স্টিফেনের এই ঐতিহাসিক পরীক্ষায় ৮৮৬ ফুট লম্বা সূতোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎকে পরিবাহিত করা হয়েছিল।

হোয়েলার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমার সাফল্য বিস্ময়কর! এবার বলো, কীভাবে এটা তুমি করলে। আমাদের আগেকার পরীক্ষাগুলোতে কোথায় ভুল হচ্ছিল?'

দুই বন্ধু গিয়ে ফায়ার-প্লেসের সামনে বসলো। গ্রে বলতে লাগলেন, 'আমাদের আগেকার পরীক্ষায় কী ভুল ছিল আজ বিকেলেই তা আকস্মিকভাবে বুঝতে পারলাম। আগে আমরা যখন দেওয়ালের সঙ্গে সূতো লাগাচ্ছিলাম তখন ধাতব হুক ব্যবহার করেছিলাম। ধাতব হুক বিদ্যুতের পরিবাহী। তাই কাচের দণ্ডে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ঐসব ধাতব হুক দিয়ে পরিবাহিত হয়ে পৃথিবীতে চলে যেতো, আইভরি বলে পৌঁছোতে পারতো না। এটা বুঝতে পেরে ধাতব হুকগুলোর সঙ্গে সরাসরি সূতো না লাগিয়ে সিল্কের তন্তু দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। সিল্ক বিদ্যুতের অপরিবাহী বলে সূতো থেকে ধাতব হুকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের পরিবহণ বন্ধ হলো! কাজেই, এবার বিদ্যুৎ কাচের দণ্ড থেকে সূতো বেয়ে সোজা আইভরি বলে গিয়ে পৌঁছোলো।'

হোয়েলারের উৎসাহে এবং সাহায্যে গ্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন পদার্থ বিদ্যুতের সুপরিবাহী; আবার কোন কোন পদার্থ বিদ্যুতের কুপরিবাহী। তিনি এও লক্ষ্য করেন যে, ধাতব পদার্থগুলো বিদ্যুতের সুপরিবাহী। যে-সব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে না তাদের বলা হয় 'অন্তরক'। তড়িদ্‌গ্রস্ত পরিবাহীকে বিধৃত রাখার জন্য

কিংবা ঘিরে রাখার জন্য অন্তরক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। স্টিফেন গ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ভিত্তিতে বর্তমানে ধাতব তারের উপর রবার বা প্লাস্টিকের অন্তরক আস্তরণ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার তৈরী হচ্ছে।

ফরাসী বিজ্ঞানী সার্লে দ্যু ফে-র আবিষ্কার

এর পর তড়িৎ-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন ফরাসী বিজ্ঞানী সার্লে দ্যু ফে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বিদ্যুৎ দুই জাতের। কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে কাচদণ্ডে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং কাচদণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তারা এক জাতের বিদ্যুৎ নয়।

দুটো কাচদণ্ডকে রেশমের কাপড় দিয়ে ঘষে রেশমী সূতোর সাহায্যে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দিলে কাচদণ্ড দুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। একইভাবে, দুটো রজনদণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দিলে দণ্ড দুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এবার একটি কাচদণ্ডকে রেশম কাপড় দিয়ে ঘষে এবং একটি রজনদণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষে এই দণ্ড দুটোকে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দিয়ে দেখা যায় যে, এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। যদি কাচদণ্ডের বিদ্যুৎ এবং রজনদণ্ডের বিদ্যুৎ সমধর্মী হতো তবে নিশ্চয়ই এদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা যেতো। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কাজেই, দ্যু ফে সিদ্ধান্তে এলেন যে, কাচদণ্ডের বিদ্যুৎ আর রজনদণ্ডের বিদ্যুৎ ভিন্নধর্মী। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, অন্তত দুই জাতের বিদ্যুৎ আছে।

এবার বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে ঘষে বস্তুগুলোকে তড়িদ্‌গ্রস্ত করা হলো। এই তড়িদ্‌গ্রস্ত বস্তুগুলোকে একে একে তড়িদ্‌গ্রস্ত

কাচদণ্ডের কাছে বা তড়িদ্‌গ্রস্ত রজনদণ্ডের কাছে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি বস্তুই কাচদণ্ড এবং রজনদণ্ডের মধ্যে একটিকে আকর্ষণ করছে, অন্যটিকে বিকর্ষণ করছে। অর্থাৎ দেখা যাবে যে, যে-কোন তড়িদ্‌গ্রস্ত বস্তুর বিদ্যুৎই কাচদণ্ডের বিদ্যুতের সমধর্মী কিংবা রজনদণ্ডের বিদ্যুতের সমধর্মী। এমন কোন তড়িদ্‌গ্রস্ত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না যে বস্তুর বিদ্যুৎ কাচদণ্ডের বিদ্যুৎ এবং রজনদণ্ডের বিদ্যুৎ—এই দুই জাতের বিদ্যুতেরই ভিন্নধর্মী। কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিদ্যুৎ কেবল দুই জাতের। কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে তাতে যে-জাতের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হতো 'ভিট্রিয়াস ইলেকট্রিসিটি' বা 'কাচ-বিদ্যুৎ' আর, রজনদণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে তাতে যে-জাতের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হতো 'রেসিনাস ইলেকট্রিসিটি' বা 'রজনবিদ্যুৎ'। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কাচবিদ্যুৎকে 'ধনাত্মক বিদ্যুৎ' এবং রজনবিদ্যুৎকে 'ঋণাত্মক বিদ্যুৎ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

কোন ধনাত্মক রাশির সঙ্গে সমান সাংখ্যিক মানের একটি ঋণাত্মক রাশি যোগ করলে যেমন যোগফল শূন্য হয় তেমনি কোন বস্তুতে সম-পরিমাণ কাচবিদ্যুৎ এবং রজনবিদ্যুৎ দিলে বস্তুটি নিস্তড়িৎ থাকে। অর্থাৎ, কাচবিদ্যুৎ এবং রজনবিদ্যুৎ পরস্পরকে প্রতিমিত করে। এই কারণেই বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এদের একটিকে ধনাত্মক তড়িৎ এবং অন্যটিকে ঋণাত্মক তড়িৎ আখ্যা দিয়েছেন।

লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আকস্মিক আবিষ্কার এবং লিডেন জার

হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার ফান মুশসেন-ব্রোক একটি কাচের ফ্লাস্কে রাখা জলে তড়িৎ মজুত করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করছিলেন। অধ্যাপক মুশসেনব্রোক দুটো রেশমী সুতোর সাহায্যে একটি লোহার দণ্ড ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। লোহার দণ্ডটির

সঙ্গে যুক্ত একটি ধাতব তার জলভরা ফ্লাস্কের কর্কের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো ছিল। অধ্যাপক মুশসেনব্রোকের ধারণা ছিল এই যে, লোহার দণ্ডটিকে তড়িদ্‌গ্রস্ত করা হলে তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে ফ্লাস্কের জলকে তড়িদাহিত করবে। কাচ অপরিবাহী বলে জলে সঞ্চিত বিদ্যুৎ জল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। অধ্যাপক মুশসেনব্রোক একহাতে ফ্লাস্কটিকে ধরে যখন অন্য হাতে লোহার দণ্ড থেকে তারটি খুলতে গেলেন তখন তিনি প্রচণ্ড 'শক্' খেলেন। এই ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে অধ্যাপক প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চিত রাখার উপযুক্ত একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটিকে বলা হয় 'লিডেন জার'। সাধারণ একটি কাচের পাত্রের ভেতরে এবং বাইরে টিনের পাত লাগিয়ে লিডেন
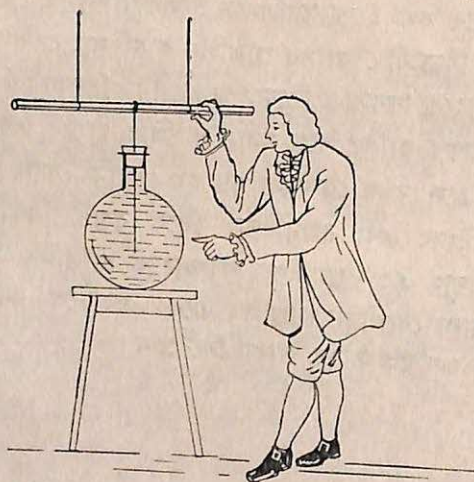
জলে তড়িৎ সঞ্চিত রাখার পরীক্ষা করছেন অধ্যাপক পিটার মুশাসেনব্রোক।

জার তৈরী করা হয়। পাত্রটির মুখে লাগানো কর্কের ঢাকনাটির মধ্য দিয়ে একটি পেতলের দণ্ড প্রবেশ করানো থাকে। দণ্ডটির নিচের প্রান্তে পেতলের তৈরী একটি সরু শেকল যুক্ত থাকে। এর সাহায্যে পেতলের দণ্ডটি কাচের পাত্রের ভেতরের টিনের পাতের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ রক্ষা করে।

লিডেন জার উদ্ভাবিত হবার পর যন্ত্রটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। জাদুকরেরা এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ সঞ্চিত করে ঐ বিদ্যুতের সাহায্যে বারুদে

আগুন ধরিয়ে কামান দাগাতেন এবং দর্শকদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করতেন। বৈদ্যুতিক শক্ খেতে কেমন লাগে তা অনুভব করে কৌতূহল মেটানোর জন্যও অনেকে লিডেন জার ব্যবহার করতো। শোনা যায়, ক্রিস্তফ ক্লেয়ার নামে জনৈক ফরাসী পাদ্রী একদল লোককে বৈদ্যুতিক শক্ খাইয়ে জব্দ করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, মঁসিয়ো ক্লেয়ার কোন কারণে চার্চের নিকটবর্তী একটি কারখানার কর্মীদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের একটু শিক্ষা দেবার জন্য এ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কারখানার কর্মীদের বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে অপরের মনে দিব্যভাব সৃষ্টি করতে পারেন। কারখানার কর্মীরা তার কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে অনুরোধ করলো তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের মনে ধর্মভাব জাগাতে। বলা বাহুল্য, মঁসিয়ো ক্লেয়ার রাজি হলেন। এক রবিবার সন্ধ্যায় প্রার্থনা সেরে ষোল জন ব্যক্তি চার্চের সামনের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলো। মঁসিয়ো ক্লেয়ারও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তাঁর হাতে ছিল লাল কাপড়ে ঢাকা

কারখানার কর্মীরা বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়লো

একটি বাক্স। বাক্সটির দু'পাশে ছিল দুটো পিতলের ক্রুশ। মঁসিয়ো ক্লেয়ার কারখানার কর্মীদের বললেন হাত ধরাধরি করে শৃঙ্খল রচনা করে

দাঁড়াতে। তাঁর কথা মতো ষোলজন ব্যক্তি হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে দাঁড়ালো। তারপর মঁসিয়ো ক্লেয়ার লাল কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে কী একটা করলেন। এরপর বাক্সটাকে হাতে ধরে তিনি কারখানার কর্মীদের বৃত্তের সামনে এসে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই জনকে বাক্সের দু'পাশে রাখা দু'টো ক্রুশকে ধরতে বললেন। তারা দুজন তাঁর কথামতো দুটো ক্রুশে হাত দিয়েই হাত ধরাধরি করে দাঁড়ানো ষোলজন ব্যক্তি এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো এবং এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়লো।

না, দিব্যভাবের ধাক্কায় নয় ; বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে। মঁসিয়ো ক্লেয়ার বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন একটি ছোট স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং একটি লিডেন জার। লাল কাপড়ের নিচে হাত দিয়ে তড়িৎ-যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তিনি লিডেন জারটিতে তড়িৎ সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। ক্রুশ দুটো যুক্ত ছিল তড়িৎ-গ্রস্ত লিডেন জারের দুই তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে। পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'জন লোক ক্রুশ দুটো ধরতেই লিডেন জারে সঞ্চিত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো ষোলজন ব্যক্তির তৈরী শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে, ফলে সকলেই এক সঙ্গে প্রচণ্ড শক্ খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। প্রবল বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার ফলে কারখানার কর্মীরা সকলেই কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং বিজলী

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক আমেরিকান তড়িৎ-বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্, সমাজসেবী এবং বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে জনৈক ডঃ স্পেন্স বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে কয়েকটি স্থির বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দেখান। এই পরীক্ষাগুলো দেখে তিনি বিস্মিত হলেন এবং তড়িৎ-বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ফ্রাঙ্কলিন নিজে বহুবার এই পরীক্ষাগুলোর

পুনরাবৃত্তি করে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের দেখান। কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে আকাশের বিজলীর চমকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে পাঠ করার উদ্দেশ্যে "বিদ্যুতের সঙ্গে বিজলীর অভিন্নতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পরিবাহীর সাহায্যে আকাশের বিদ্যুৎকে হয়তো মাটিতেও নামিয়ে আনা যাবে। তাঁর প্রবন্ধটি যখন রয়েল সোসাইটির সভায় পাঠ করা হয় তখন উপস্থিত সদস্যরা প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু নিয়ে হাসি-তামাসা করতে থাকে।

এই হাসি-তামাসার যোগ্য জবাব দেবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি তাঁর মতবাদকে প্রমাণ করে দেখাবেন। তিনি একটি ঘুড়ি তৈরী করে বজ্র-বিদ্যুতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। উপযুক্ত একটি দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তিনি তাঁর ঘুড়ি উড়িয়ে দিলেন একটি লম্বা পরিবাহী সূতোর সাহায্যে। সূতোর সঙ্গে তিনি বেঁধে দিলেন একটি চাবি। চাবির একপ্রান্তে একটি রেশমের ফিতে

বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মেঘে সঞ্চিত বিদ্যুৎকে সূতোর সাহায্যে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ঘুড়ি উড়াচ্ছেন।
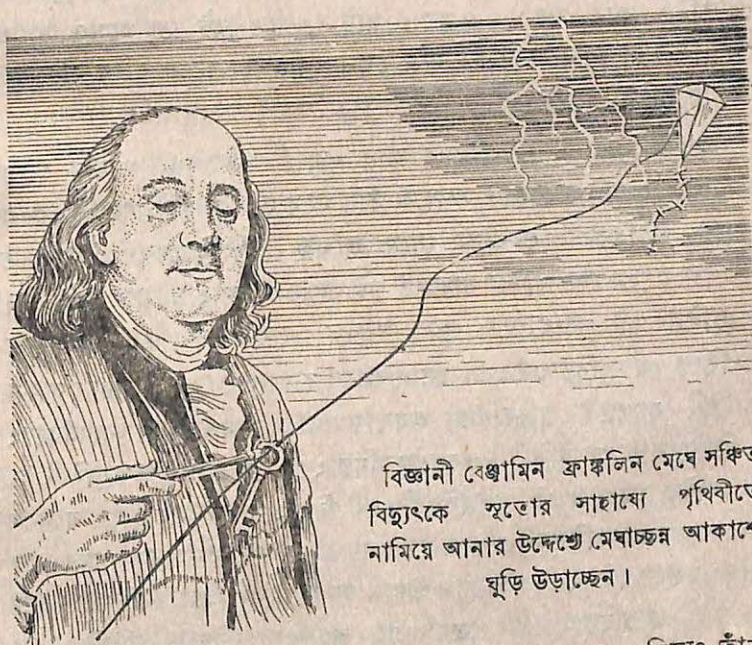
বেঁধে ঐ ফিতেটা ধরে রাখলেন তিনি যাতে আকাশের বিদ্যুৎ তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে যেতে না পারে। ফ্রাঙ্কলিন এবার একটি ভূ-সংলগ্ন

পরিবাহীকে এই চাবির কাছে ধরলেন এবং স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করতে সমর্থ হলেন। এর পর তিনি চাবির সঙ্গে একটি লিডেন জার যুক্ত করে তাতে বিপুল পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চিত করতে সক্ষম হলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এই পরীক্ষাটি ছিল ভয়ানক বিপজ্জনক। এ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে তিনি যে মারা যান নি সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়।

এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে বজ্রপাতের হাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষা করার জন্য তৈরী হলো 'বজ্রনিবারক' বা 'বজ্রবহ'। বজ্রনিবারক প্রকৃতপক্ষে একটি ধাতব দণ্ড। কোন অট্টালিকাকে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সেই অট্টালিকার উপর থেকে মাটি পর্যন্ত খাড়াভাবে এই দণ্ডটি লাগিয়ে নেওয়া হয়। ধাতব দণ্ডটির উপরে থাকে কয়েকটি সূঁচোলো পরিবাহী। তড়িদ্‌গ্রস্ত মেঘ যখন ঐ অট্টালিকার উপরে আসে তখন বজ্রনিবারক দণ্ডের সূঁচোলো অগ্রভাগ থেকে মেঘের বিদ্যুতের বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয়ে মেঘের দিকে ধাবিত হয় এবং মেঘের বিদ্যুৎকে প্রতিমিত করে দেয়। এ সত্ত্বও যদি বজ্রপাত ঘটে তা হলেও তাতে অট্টালিকার কেন ক্ষতি হয় না, কেননা বিদ্যুৎ ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে চলে যায়। ফলে অট্টালিকার কোন ক্ষতি হয় না।

তড়িৎ-বিজ্ঞানে ফ্রাঙ্কলিনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পদার্থের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ। ফ্রাঙ্কলিনের কিছুকাল আগে উইলিয়াম ওয়াটসন্ নামে জনৈক ঔষধবিক্রেতা এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রতিটি বস্তুতেই দুই জাতের বিদ্যুৎ আছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই মতবাদের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে ঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন প্রতিটি বস্তুতেই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে সমপরিমাণ কাচবিদ্যুৎ (ভিট্রিয়াস ইলেকট্রিসিটি) এবং রজনবিদ্যুৎ (রেজিনাস ইলেকট্রিসিটি)। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ সমানভাবে থাকে বলে এ অবস্থায় বস্তুর তড়িদ্‌ধর্ম প্রকাশ পায় না। ঘর্ষণের সময় এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুতে বিদ্যুতের আদান-প্রদান হয়। ফলে এরা তড়িদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাচবিদ্যুৎ এবং রজনবিদ্যুৎ পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিমিত করে বলে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন প্রথমটিকে 'ধনাত্মক বিদ্যুৎ' এবং দ্বিতীয়টিকে 'ঋণাত্মক বিদ্যুৎ' আখ্যা দেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে,

দু'জাতের বিদ্যুৎই সমান মৌলিক। ধনাত্মক বিদ্যুৎ কোন বিশেষ ধনে ধনী আর ঋণাত্মক বিদ্যুৎ ঋণী—এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। কেবলমাত্র প্রথাগতভাবেই এদের একটিকে ধনাত্মক ধরা হয়। উল্টোটা ধরলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তবে, এখন আর যথেচ্ছভাবে যে-কোন একটিকে ধনাত্মক এবং অন্যটিকে ঋণাত্মক বলা যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিক্রমে কাচবিদ্যুৎকে ধনাত্মক এবং রজনবিদ্যুৎকে ঋণাত্মক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙ এবং গ্যালভানির আকস্মিক আবিষ্কার

স্টিফেন গ্রের গবেষণা থেকে প্রবাহী তড়িতের বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু তখনও স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ উৎপন্ন করে যে-তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী, কেননা স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য বৈদ্যুতিক চাপ বজায় রাখার ব্যবস্থার উদ্ভাবন তখনও সম্ভবপর হয় নি। এ ব্যাপারে সাফল্যের পেছনে প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভানি।

লুইগি গ্যালভানি ছিলেন ইতালীয় বোলোনা শহরে অ্যানাটমির অধ্যাপক। মানবদেহ, দেহের নানান ব্যাধি আর তাদের নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে অধ্যাপক গ্যালভানি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি হঠাৎ কী-ভাবে তড়িৎ-সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন ঠিক জানা যায় না। এ সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী আছে। শোনা যায় যে, তিনি একদিন একটা লোহার রেলিং থেকে ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙের একজোড়া পা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলোকে শুকোনোর উদ্দেশ্যে। কাটা ব্যাঙটা ঝোলানো হয়েছিল তামার হুকের সাহায্যে। ব্যাঙের পা দু'টো বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। গ্যালভানির নজরে পড়লো যে, ব্যাঙের পা দুটো যতবার বাতাসে আন্দোলিত হয়ে লোহার রেলিং স্পর্শ করছে ততবারই ব্যাঙের

পা দুটো কুচ্‌কে যাচ্ছে। অধ্যাপক গ্যানভানি কিছুক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন এবং এর কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, ব্যাঙের পায়ের এই কুচ্‌কে যাওয়ার কারণ হলো 'বিদ্যুৎ'। তিনি টর্পেডো মাছের কথা শুনেছিলেন—যে-মাছ বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে অন্য মাছকে মেরে ফেলতে পারে। তিনি বৈদ্যুতিক বাণমাছের কথাও শুনেছিলেন। জেলেরা মাঝে মাঝে মাছ ধরতে গিয়ে এসব মাছ থেকে বৈদ্যুতিক শক্ খাবার কথা বলতো।

ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙের কুঞ্চন লক্ষ্য করছেন বিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভানি।

এসব কথা মনে হতেই তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, প্রাণিদেহে বিদ্যুৎ আছে। তিনি এই বিদ্যুতের নাম দিলেন 'প্রাণী-বিদ্যুৎ'। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যাঙের দেহের বিদ্যুতের জন্যই ব্যাঙের পা সঙ্কুচিত হয়। ব্যাঙের দেহের বিদ্যুৎ স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশীর মধ্য দিয়ে গিয়ে ব্যাঙের দেহের সঙ্কোচন ঘটায়।

গ্যালভানি একটি গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর এই আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করলেন। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে গ্যালভানির এই প্রবন্ধ পড়লেন এবং বুঝলেন যে গ্যালভানি একটি অতি মূল্যবান্ আবিষ্কার করেছেন। 'প্রাণী-বিদ্যুৎ' নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে তখন নানান চিন্তা-ভাবনা এবং আলোচনা চলতে লাগলো।

আজ অবশ্য আমরা জানি যে, ব্যাঙের পায়ের সঙ্কোচন-সম্পর্কে গ্যালভানি যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা আংশিক সত্য। এ কথা ঠিক যে, ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙের পা দুটোর সঙ্কোচনের কারণ ছিল বিদ্যুৎ। কিন্তু তাঁর 'প্রাণী-বিদ্যুৎ' মতবাদটি ছিল ভ্রান্ত। গ্যালভানির আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই আলেসান্দ্রো ভোল্টা নামে ইতালীয় এক পদার্থবিদ্ ব্যাঙের পায়ের সঙ্কোচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেন।

যদিও গ্যালভানির প্রাণী-বিদ্যুৎ মতবাদটি পরিত্যক্ত হয়েছে তবুও তড়িৎ-বিজ্ঞানে গ্যালভানির অবদানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং তা থেকেই তড়িৎ-কোষের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক সময়ে অনেক ভ্রান্ত মতবাদও বিজ্ঞানকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। নির্ভুল মতবাদকে প্রমাণ ক'রে যেমন বিজ্ঞানীরা নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, ভ্রান্ত-মতবাদকে অপ্রমাণ করতে গিয়েও তেমনি নতুন সত্যের সন্ধান পান।

ভোল্টা এবং তাঁর উদ্ভাবিত তড়িৎ-কোষ

গ্যালভানির প্রাণী-বিদ্যুতের ধারণা প্রকাশিত হবার পর ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণাগারে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। বহু বিজ্ঞানী প্রাণী-বিদ্যুৎ-তত্ত্ব সমর্থন করলেও কয়েকজন বিজ্ঞানী এ তত্ত্ব-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলেই অবশ্য এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, গ্যালভানির পরীক্ষায় ব্যাঙের পায়ের কুঞ্চনের কারণ ছিল বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কিন্তু ব্যাঙের দেহই এ বিদ্যুতের উৎস—গ্যালভানির এ সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী-মহলে বহু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বহু বিজ্ঞানী নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এ তত্ত্বের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

গ্যালভানির প্রাণী-বিদ্যুৎ তত্ত্বের বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইতালীর পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলেসান্দ্রো ভোল্টা। ভোল্টা ছিলেন তড়িৎ-বিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ। প্রাণী-বিদ্যুৎ সম্পর্কে গ্যালভানির প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর স্বাভাবিক-ভাবেই ভোল্টা এ সম্পর্কে আগ্রহী হন। তিনি নিজের পরীক্ষাগারে গ্যালভানির পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন। ব্যাঙের দেহের কুঞ্চনের জন্য দায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এ রহস্যের সমাধানের জন্য

তিনি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন এবং দেখান যে, প্রাণী-বিদ্যুৎ তত্ত্ব মেনে নিলে অনেক পরীক্ষালব্ধ সত্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী ভোল্টা ব্যাঙের দেহে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। তড়িৎ-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এটি ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভোল্টা জানতেন যে, গ্যালভানির পরীক্ষায় ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙটাকে তামার হুকের সাহায্যে লোহার রেলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, তামার হুকের পরিবর্তে যদি লোহার হুক থেকে কোন কাটা ব্যাঙ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা হলে লোহার রেলিং স্পর্শ করলেও ব্যাঙের পা কুঞ্চিত হয় না। তিনি দেখলেন, ব্যাঙের পায়ের কুঞ্চনের জন্য হু'টো ধাতুর উপস্থিতি প্রয়োজন। মাত্র একটি ধাতু থাকলে কিংবা কোন ধাতু না থাকলে ব্যাঙের পায়ের কুঞ্চন ঘটে না। কাজেই প্রশ্ন উঠলো, ব্যাঙের দেহেই যদি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তা হলে ব্যাঙের পায়ের কুঞ্চন ঘটাতে হুটো ভিন্ন ধাতুর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে কেন? রহস্য-সমাধানের এটি ছিল একটি মূল্যবান সূত্র। এই সূত্রের ভিত্তিতেই ভোল্টা সিদ্ধান্তে আসেন যে, গ্যালভানির পরীক্ষায় বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎস ছিল রাসায়নিক বিক্রিয়া। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হুটো ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ যখন কোন উপযুক্ত দ্রবণের সংস্পর্শে আসে তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। গ্যালভানির পরীক্ষায় এই দ্রবণটি ছিল ব্যাঙের দেহ-কলায় বিদ্যমান জলীয় দ্রবণ। এই দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই ব্যাঙের শরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্যাঙের পায়ের কুঞ্চন ঘটেছিল।

ভোল্টা কেবল এ কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁর মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হুটো ধাতুর সঙ্গে ব্যাঙের দেহের পরিবর্তে একটি উপযুক্ত দ্রবণ ব্যবহার ক'রে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে দেখালেন। এ পরীক্ষা থেকেই উদ্ভাবিত হলো মানুষের তৈরী প্রথম 'তড়িৎ-কোষ' বা 'ব্যাটারী'। কোন্ কোন্ ধাতু নিলে সবচেয়ে ভালো হবে, কোন্ দ্রবণ সবচেয়ে কার্যকরী হবে—পরীক্ষাই একমাত্র এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তিনি দেখলেন যে, তামা এবং দস্তার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে ভিজানো কাপড় বা ব্লটিং পেপার রেখে তড়িৎ-কোষ তৈরী করা যায়। তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়ানোর

উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি তামার চাক্‌তি এবং দস্তার চাক্‌তি দিয়ে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই স্তূপে তিনি পর্যায়ক্রমে একটি করে তামার চাক্‌তি এবং একটি করে দস্তার চাক্‌তি স্থাপন করেন। প্রতি জোড়া চাকতির মধ্যে তিনি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে ভেজানো ব্লটিং পেপার রেখেছিলেন, দুই প্রান্তের চাক্‌তি দুটোকে একটি তারের সঙ্গে যুক্ত করলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। ভোল্টার তৈরী এই স্তূপটিকে 'ভোল্টীয় স্তূপ' বলা হয়। একটি কাচের পাত্রে কিছু পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে ঐ অ্যাসিড

বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টা এবং তাঁর উদ্ভাবিত ভোল্টীয় স্তূপ।

দ্রবণে একটি তামার দণ্ড এবং একটি দস্তার দণ্ড ডুবিয়ে ভোল্টা একটি তড়িৎ-কোষ গঠন করেছিলেন। এই কোষকে 'ভোল্টীয় কোষ' বলা হয়।

ভোল্টার আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হবার পর বিজ্ঞানীরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত গবেষণাগারে ব্যাঙের গুরুত্ব হ্রাস পেলো। ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙ পরীক্ষাগার থেকে নির্বাসিত হলো এবং খাবার টেবিলে ফিরে গেল। বিজ্ঞানীরা ভোল্টার উদ্ভাবিত তড়িৎ-কোষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ভোল্টার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হলো। তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবিত হবার ফলে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টির উপায় বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হলো। ভোল্টার পর বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ব্যাটারীর উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় নানান ধরনের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে। তবে, ব্যাটারী থেকে যে-তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। বর্তমানে তড়িৎ-শক্তির উৎস হিসেবে জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। তবু, এখনও ব্যাটারীর নানান প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। টর্চে, বহনযোগ্য রেডিও সেট-এ এবং মোটর গাড়িতে ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়। টেলিগ্রাফ এবং সরল টেলিফোন ব্যবস্থায়ও ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যে-যন্ত্র পৃথিবীতে বেতার সঙ্কেত পাঠায় সেই যন্ত্রও কাজ করে ব্যাটারীর শক্তিতে।

ভোল্টা তাঁর উদ্ভাবিত তড়িৎ-কোষের কথা প্রকাশ করার পর থেকে ইউরোপের সমস্ত গবেষণাগারেই তড়িৎ-কোষ একটি অনিবার্য সামগ্রী হয়ে উঠলো। ভোল্টা ছিলেন ভাগ্যবান। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিপুল সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভোল্টার সম্মানার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক এককের নাম দেওয়া হয়েছে ভোল্ট।

রয়েল ইনস্টিটিউট এবং বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভি

শীঘ্রই বোঝা গেল যে, একাধিক তড়িৎ-কোষ দিয়ে উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন ব্যাটারী তৈরী করা সম্ভবপর এবং ঐরূপ ব্যাটারী থেকে উচ্চ

মানের তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউটে বহুসংখ্যক কোষ যুক্ত করে একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ব্যাটারী তৈরী করা হয়েছিল।

রয়েল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা কাউন্ট বেঞ্জামিন রামফোর্ড তাঁর এই ব্যাটারীর জন্য গর্বিত ছিলেন, যেমন গর্বিত ছিলেন তাঁর গবেষণাগারের অন্যান্য উন্নত ধরনের যন্ত্রাদির জন্য। রামফোর্ড তাঁর গবেষণাগারের উন্নতিকল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। কিন্তু ঐ সময়ে তিনি অর্থের অভাবে অনেক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারছিলেন না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দাম ছিল বেশি, কিন্তু ইনস্টিটিউটের কোষাগারে অর্থের পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। 'কী করা যায়?' রামফোর্ড ভাবতে লাগলেন।

ল্যাবরেটরির জন্য কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায় এ কথা ভাবতে ভাবতে একটা মতলব কাউন্ট রামফোর্ডের মাথায় এলো। তিনি জানতেন যে, জনসাধারণ বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত নানান নতুন আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন-সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এবং কৌতূহলী। জনসাধারণের এই কৌতূহল এবং আগ্রহ কি গবেষণাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উপায় হতে পারে না? সাধারণ মানুষ তড়িৎ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা শোনার জন্য এবং তড়িতের নানান ক্রিয়া-সংক্রান্ত পরীক্ষা দেখার জন্য কি অর্থব্যয় করবে না? চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বক্তৃতার দিনক্ষণ স্থির করে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। এতে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল। যত দিন যেতে লাগলো শ্রোতার সংখ্যা ততো বাড়তে লাগলো। রামফোর্ড বুঝলেন যে, উচ্চ মানের এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতার আয়োজন করতে পারলে শ্রোতার অভাব হবে না। রয়েল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিষয়ে সুপণ্ডিত; কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করা যায় না। বক্তৃতা দেবার জন্য এমন কাউকে প্রয়োজন যে কেবল শ্রোতাদের কৌতূহল মেটাবে না, তাদের আনন্দও দিতে পারবে। বিজ্ঞান-জানা এমন বক্তা কোথায় পাওয়া যাবে? রামফোর্ড উপযুক্ত লোকের জন্য খোঁজখবর নিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত রামফোর্ড তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে হাম্‌ফ্রি ডেভি নামে তেইশ বছর বয়স্ক এক যুবককে বক্তা হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় কাউন্ট রামফোর্ড শ্রোতাদের মধ্যে বসে ডেভির প্রথম বক্তৃতা শুনলেন এবং বুঝলেন, বক্তা-নির্বাচনে তিনি ভুল করেন নি। বয়সে প্রবীণ না হলেও রসায়ন এবং বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান-সম্পর্কে ডেভির জ্ঞান ছিল সুগভীর। তার চেয়েও বড়ো কথা, শ্রোতাদের মনোযোগ কীভাবে আকর্ষণ করতে হয়, কীভাবে তাদের মনে বিজ্ঞানের নানান অজানা বিষয়-সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতে হয় এবং কীভাবে বক্তৃতাকে উপভোগ্য করে তুলতে হয় তা ডেভির ভালভাবেই জানা ছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলো ছিল যেন ম্যাজিক শো! পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহযোগে সেগুলো খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। বক্তৃতাকালে ডেভি যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখাতেন সেগুলো দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ হতো এবং করতালি দিয়ে ডেভিকে তাদের অভিনন্দন জানাতো। ডেভির প্রতিটি বক্তৃতায় শ্রোতারা নতুন কিছু জানতে পারতো, নতুন কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারতো।

ডেভির ওজস্বিতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বে অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্ঞানের এই বক্তৃতামালা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। একবার যে ডেভির বক্তৃতা শুনলো সে বার বার আসতে লাগলো। অনেকে আবার তাদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসতে লাগলো। এর ফলে রয়েল ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে লাগলো। হাম্‌ফ্রি ডেভিও অল্প দিনের মধ্যে লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।

বিজ্ঞানী হাম্‌ফ্রি ডেভি

কিন্তু ডেভি তাঁর এই জনপ্রিয়তাতেই আত্মতুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানী। রয়েল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তিনি এই ইনস্টিটিউটের উন্নত গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এই গবেষণাগারের শক্তিশালী ভোল্টীয় ব্যাটারীটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং এটি ব্যবহার করে তিনি নানান ধরনের

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টা করতেন। একদিন গবেষণাগারে বসে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত তার দুটোর মুক্ত প্রান্ত একটি জলের বীকারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ডেভি দেখলেন, তৎক্ষণাৎ তার দুটোর ওপর বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হচ্ছে! এই বুদ্‌বুদ্‌গুলো কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে? ডেভি ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল যে, উইলিয়ম নিকলসন এবং স্যার অ্যান্টনী কর্লিস্‌ল্‌ নামে দুজন বিজ্ঞানীর একটি প্রবন্ধ তিনি পড়েছিলেন। এই দুই বিজ্ঞানীও জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়েছিলেন এবং বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হতে দেখেছিলেন। তাঁরা অনুমান করেছিলেন যে, তড়িৎ-প্রবাহের ফলে জল থেকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে এসে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি
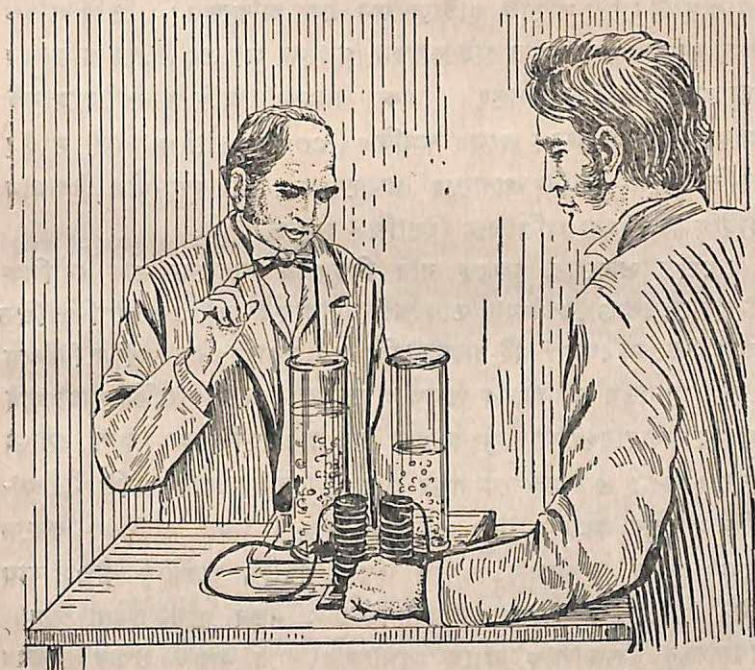
উইলিয়ম নিকলসন এবং স্যার অ্যান্টনী কর্লিস্‌ল্‌ জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত পরীক্ষা করছেন।

করে। অবশ্য এ সম্পর্কে তাঁরা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন নি। উৎপন্ন বুদ্‌বুদের গ্যাসের প্রকৃতি কী এবং কেন এই বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হচ্ছে তা নির্ধারণ করার জন্য ডেভি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

ডেভি একটি বীকারে কিছুটা পরিশ্রুত জল (Distilled water) নিয়ে ঐ জলের মধ্যে দুটো তার প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তার দুটোর নিমজ্জিত প্রান্ত তিনি দুটো জলভরা টেস্ট টিউবের নিচে রাখলেন যাতে উৎপন্ন গ্যাস এই দুই টেস্ট টিউবে জমা হয়। এর পর এই দুই তারের অন্য প্রান্ত ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত করে জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ বুদ্‌বুদের আকারে গ্যাস বেরিয়ে দুই টেস্ট টিউবে জমা হতে লাগলো। ডেভি লক্ষ্য করলেন যে, দুই টিউবে একই হারে গ্যাস জমা হচ্ছে না। একটিতে যে-আয়তন গ্যাস জমা হচ্ছে অন্যটিতে জমা হচ্ছে তার দ্বিগুণ পরিমাণ। কিছুক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে তিনি দুই টেস্ট টিউবে কিছু পরিমাণ গ্যাস পেলেন। ডেভি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, গ্যাস দুটো সত্যি সত্যিই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন! তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন উৎপন্ন অক্সিজেন গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ। এক আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে দুই আয়তন হাইড্রোজেন! জলের সংযুতিও (composition) তো তাই! ডেভি বুঝলেন, তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে জল তার দুই মৌল উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভাজিত হয়েছে।

ডেভি ভাবলেন, জলকে যদি বিদ্যুতের সাহায্যে তার মৌলিক উপাদানে ভেঙে ফেলা যায় তবে অন্য পদার্থকেই বা এভাবে বিভাজিত করা যাবে না কেন? এই ধারণাটি ছিল যুগান্তকারী। রসায়নবিদ্ হিসেবে ডেভি জানতেন যে, অনেক পদার্থ আছে কোন জানা পদ্ধতির সাহায্যেই যাদের উপাদানগুলোকে পৃথক করা যায় না। ডেভির মনে হলো, হয়তো বিদ্যুৎ-প্রবাহ এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে। ডেভি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন এবং এমন কতকগুলো পদার্থকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন যে-গুলোকে আগে কখনো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় নি। ডেভির এ সাফল্যে রসায়ন-বিজ্ঞানে নতুন যুগের সূচনা হলো। বিদ্যুতের ইন্দ্রজালকে কাজে লাগানোর আর একটি উপায় মানুষের করায়ত্ত হলো।

ডেভির উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলা হয়। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বহুল ব্যবহার আছে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলেই বহু ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবপর হয়েছে, কেন না এই পদ্ধতির সাহায্যেই অল্প খরচে বহু ধাতুর নিষ্কাশন সম্ভবপর হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ ধাতু ব্যবহার করে আসছে। মানুষ বোধ করি তামার ব্যবহারই প্রথম শিখেছিল, কেননা তামাকে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কোন রকম বিশুদ্ধিকরণ ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। প্রাচীন যুগের মানুষ জেনেছিল যে, তামাকে পিটিয়ে নানান রকম হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভবপর। অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত লোহাও মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহার করছে। কিন্তু বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করে তা ব্যবহার করতে শিখতে মানুষের বহুকাল লেগেছিল। এ ছাড়া খনিজ থেকে বিশুদ্ধ ধাতু পৃথক করা ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য।

ধাতু-নিষ্কাশনে তড়িৎ-প্রবাহ

বর্তমানে মানুষ নানান প্রয়োজনে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করছে। অ্যালুমিনিয়াম হাল্‌কা এবং উজ্জ্বল ধাতু, তাই অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সুবিধাজনক। অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে বাসনপত্র, রান্নার প্যান, নানান যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করে নানান প্রয়োজনীয় সঙ্কর ধাতু গঠন করা হয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ পদার্থ থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন এবং প্রয়োজনীয় শোধন খুব সহজ ছিল না। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, অ্যালুমিনিয়ামের নানান ভৌত ধর্ম ব্যবহারিক দিক দিয়ে যথেষ্ট মূল্যবান। তাই বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী অ্যালুমিনিয়াম-ঘটিত খনিজ পদার্থ থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করার স্বল্প-ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি-উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এক পাউণ্ড

অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে খরচ পড়তো প্রায় ৫৫০ মার্কিন ডলার। এ সময়ে অ্যালুমিনিয়াম ছিল সোনা এবং রূপোর চেয়েও দামী!

কয়েক বছর পর, আঁরি ছ্যভিল্ নামে জনৈক ফরাসী রসায়নবিদ্ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের একটি উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত কম-ব্যয়সাধ্য পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে তিনি দর্শকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ড সাজিয়ে রেখেছিলেন। এই ধাতু উৎপাদনে খরচ পড়েছিল পাউণ্ড প্রতি প্রায় ৫০ মার্কিন ডলার। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন এবং এই ধাতুদণ্ডগুলোকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ছ্যভিল্ সম্রাটকে তাঁর শিশুপুত্রের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটি খেলনা উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট উপহারটি পেয়ে খুব খুশি হলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজে ব্যবহারের জন্য অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ফর্ক, চামচ, প্লেট ইত্যাদি তৈরী করার আদেশ দিলেন। ভোজে বিশেষ অতিথিদের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ছুরি, কাঁটা দিয়ে ভোজ-টেবিল সাজানো হতো। আর সাধারণ অতিথিদের ভোজ-টেবিল সাজানো হতো রূপো এবং সোনার তৈরী থালা, ছুরি, চামচ দিয়ে। সে-সময়ে সোনা এবং রূপোর চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের দাম বেশি ছিল বলে এর কৌলীন্যও বেশি ছিল।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-সময়ে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কোন দ্রুত পদ্ধতি ছিল না। এর দামও ছিল অত্যধিক। তাই অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন সম্ভবপর হয় নি। অ্যালুমিনিয়াম-ঘটিত খনিজ পদার্থের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু খনিজ পদার্থ থেকে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করার কোন সহজ পদ্ধতি তখনো মানুষ আয়ত্ত করতে পারে নি। তাই অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হতে পারে নি। তবে বিজ্ঞানীরা এরূপ একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছিলেন বিজ্ঞানী চার্লস হল্।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে চার্লস হল্ ছিলেন ওহিও শহরের ওবার্লিন কলেজের ছাত্র। রসায়নশাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। তিনি কলেজের

রসায়নের পরীক্ষাগারে যথেষ্ট সময় কাটাতেন। একদিন তাঁর এক অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন যে, যে-বিজ্ঞানী সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন তিনি মানবজাতির অসীম কল্যাণ করবেন এবং তিনি বিপুল অর্থশালীও হবেন। অধ্যাপকের একথা শুনে হল্ ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা করার সঙ্কল্প করলেন।

ওবার্লিন কলেজ থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক হয়ে চার্লস বাড়ি ফিরে এসে যখন ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করার ইচ্ছার কথা বললেন তখন তাঁর বাবা আপত্তি করলেন না। চার্লসের বাবা তাঁর ছেলের প্রতিভা-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, চার্লস চেষ্টা করলে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি চার্লসকে উৎসাহই দিলেন। কয়েক-দিনের মধ্যেই বাড়ির পেছনে কাঠের ছাউনি দিয়ে চার্লসের জন্য গবেষণাগার তৈরী হলো এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলো। যুবক চার্লস গবেষণার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। তিনি দিবারাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং মাত্র ন' মাসের চেষ্টায় তিনি বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে সমর্থ হলেন। চার্লস এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন বিদ্যুতের সহায়তায়। চার্লসের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ :

তিনি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে গলিয়ে ঐ গলন্ত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়েছিলেন। তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের অক্সিজেন এবং অ্যালুমিনিয়াম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে গলন্ত খনিজ পদার্থে নিমজ্জিত দুটি তড়িদ্দ্বারের একটিতে অক্সিজেন এবং অন্যটিতে অ্যালুমিনিয়াম জমা হতে থাকে।

অবশেষে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি সহজ এবং স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ পদ্ধতি মানুষের করায়ত্ত হলো। মানুষ বিদ্যুৎকে নতুন কাজে লাগাতে শিখলো। তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম-নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবিত হবার পর অ্যালুমিনিয়ামের দাম কমে গেল। চার্লস হল্-এর এই সাফল্যের ফলে অ্যালুমিনিয়াম আর কেবল ধনীদের ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে রইলো না, ঘরে ঘরে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহৃত হতে লাগলো।

তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ব্যবহার করে যে কেবল অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাশন এবং শোধন করা যায় তাই নয়। বর্তমানে তামা, সীসা, দস্তা ইত্যাদির শোধনেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো এক ধাতুর ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া। এ পদ্ধতিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎ-প্রলেপন বলা হয়। লোহা, তামা, টিন ইত্যাদি ধাতুর তৈরী বাসনপত্র, নানা যন্ত্রাংশ, গহনা ইত্যাদির ওপর নিকেল, ক্রোমিয়াম, দস্তা, সোনা, রূপো ইত্যাদির প্রলেপ দেওয়া হয়। লোহার ওপর এ ধরনের প্রলেপ লোহাকে মরচে-ধরা থেকে রক্ষা করে।

ভোল্টার আবিষ্কারে জানা গিয়েছিল যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে। আর ডেভির গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে, তড়িৎ-প্রবাহও তেমনি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। তাঁদের এই মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য এ দুই বিজ্ঞানী তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দুই বিজ্ঞানীর পর আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এসব আবিষ্কারের ফলে তড়িতের সঙ্গে চুম্বকত্বের সম্পর্কটা বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বিজ্ঞানী ওয়রস্টেড এবং তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া

লোডস্টোনের রহস্যজনক আকর্ষণ-ক্ষমতা নিয়ে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তা করে আসছে। কিন্তু চুম্বকত্বের কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় নি। আলেসান্দ্রো ভোল্টা যেদিন ব্যাটারী উদ্ভাবন করলেন সেদিন স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করার একটি উপায় মানুষের করায়ত্ত হলো।

চুম্বকত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা তখনও চিন্তা করছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, চুম্বক ও বিদ্যুতের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু তা ছিল বিজ্ঞানীদের অনুমান মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাসঘরে আকস্মিকভাবেই প্রমাণিত হলো যে, বিজ্ঞানীদের এই অনুমান মিথ্যে নয়। বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকত্বের সত্যি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে হানস্ ওয়রস্টেড যেদিন কোপেনহেগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন সেদিন তিনি ছিলেন তৃপ্ত, গর্বিত। তের বছর আগে তিনি ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এখানে। আজ তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। যে-সব ক্লাসঘরে তিনি ছাত্র হিসেবে বসতেন সে-সব ক্লাসঘরে আজ তিনি তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত গবেষণাগারটি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজকর্ম করার জন্য।

অল্পদিনের মধ্যেই হানস্ ওয়রস্টেড অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেন। ছাত্ররা তাঁর ক্লাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ। একদিন সকালে অধ্যাপক ওয়রস্টেড একটি ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন। সেদিনের পড়ানোর বিষয় ছিল 'তড়িৎ-কোষ'। ক্লাসঘরের টেবিলে ছিল একটি ব্যাটারী। ছাত্ররা টেবিলের চারপাশে তাদের অধ্যাপককে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অধ্যাপক ব্যাটারীর বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া এবং ব্যাটারীর কার্য-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছিলেন। অধ্যাপক ব্যাটারীর দুই তড়িদ্-দ্বারের সঙ্গে একটি তার যোগ করে দেখালেন যে, তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

টেবিলে একটা ছোট কম্পাস পড়ে ছিল। সে দিনের পাঠ্য বিষয়ের আলোচনায় এই কম্পাসের কোন প্রয়োজন ছিল না। যে-তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয়েছিল কম্পাসটা ছিল ঠিক তার তলায়। আকস্মিকভাবেই কম্পাসের কাঁটাটা প্রফেসর ওয়রস্টেডের নজরে পড়লো। কম্পাসের কাঁটাটা উত্তর দিকে মুখ করে ছিল না, কাঁটাটার মুখ ছিল প্রায় পূব দিকে। ওয়রস্টেড যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি ব্যাটারী থেকে তারটা খুলে ফেললেন। এবার

দেখলেন যে, কাঁটাটা কয়েকবার দোল খেয়ে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

ওয়রস্টেড বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, সত্যিই কি তিনি কম্পাসের কাঁটাটাকে পূর্বদিকে মুখ করে থাকতে দেখেছেন? তবে কি কম্পাসের ওপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাব আছে? তিনি তো এত দিন ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছেন যে, বিদ্যুৎ এবং চুম্বকত্ব দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া!

বিজ্ঞানী হানস্ ওয়রস্টেড

ভোল্টীয় কোষ-সম্পর্কে ছাত্রদের কী যেন বলছিলেন প্রফেসর ওয়রস্টেড। কিন্তু ছাত্ররা সে-সব এলোমেলো অসংলগ্ন কথার তাৎপর্য-বুঝতে পারছিলো না। অধ্যাপক ওয়রস্টেড তো কোনদিন ক্লাসে এমন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন নি! ছাত্ররা ফিস্ ফিস্ শুরু করে দিল। তারা বুঝলো, কোন কারণে অধ্যাপকের মন আজ বিক্ষিপ্ত। ওয়রস্টেডও বুঝলেন, আজ তাঁর পক্ষে আর ক্লাস নেওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি ছাত্রদের বললেন, 'আজ এ পর্যন্তই থাক। বাকিটা আগামী দিন আলোচনা করবো।'

ছাত্ররা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেই তিনি কম্পাসটা হাতে তুলে নিলেন। কম্পাসটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে। এই তো, কাঁটাটা উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হলো। এবার তিনি তারটিকে ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত করে তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালেন। এর পর সেই তারটিকে কম্পাসের উপর ধরলেন। না, চোখ তাঁকে প্রতারিত করে নি। এবারেও তিনি দেখলেন যে, তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কম্পাসের কাঁটা বিক্ষিপ্ত হলো। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ বদলালে কম্পাসের কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখও বদলায়।

ওয়রস্টেড উত্তেজিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে ঘরে ছুটে গেলেন। তাঁর সহকর্মীরা প্রফেসর ওয়রস্টেডের উত্তেজনা দেখে অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই তিনি কোন বড়ো রকমের আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা সবাই এসে জড়ো হলেন ওয়রস্টেডের ল্যাবরেটরিতে। অধ্যাপক ওয়রস্টেড তাঁর সহকর্মীদের সামনে পরীক্ষাটি আবার করে দেখালেন। দর্শকেরা ওয়রস্টেডের আশ্চর্য আবিষ্কারে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তাঁরা দেখলেন, তড়িৎ-প্রবাহে চুম্বকত্ব আছে!

ওয়রস্টেড বুঝলেন যে, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর এ আবিষ্কারের কি কোন ব্যবহারিক মূল্য আছে? এ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি সময় নষ্ট করলেন না। ওয়রস্টেড কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁর আবিষ্কারের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। প্যারিসের এক পলিটেকনিক স্কুলের অধ্যাপক আঁদ্রে আম্পিয়ের-এর কাছেও ওয়রস্টেডর আবিষ্কারের খবর পৌঁছে গেল।

আঁদ্রে আম্পিয়ের এবং তাঁর উদ্ভাবিত তড়িচ্চুম্বক

আঁদ্রে আমপিয়ের ছিলেন একজন দুঃখী এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। সারা জীবনেও তিনি কৈশোরের সেই ভয়াবহ রাতটার কথা ভুলতে পারেন নি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। পরিবারের সবাই সবে ডিনার শেষ করেছে। আঁদ্রে বসে পড়াশুনো করছিলেন। এমন সময়ে বাইরে হট্টগোল শোনা গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের ঘরের দরজা ভেঙে পড়লো। হুড়হুড় করে একদল বিপ্লবী সৈনিক তাঁদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। আঁদ্রে কিংবা তাঁর মায়ের সমস্ত অনুনয় ও করুণাভিক্ষা ব্যর্থ হলো। আঁদ্রের বাবা আর কখনো ফিরে আসেন নি। ফরাসী বিপ্লবের পর সারা ফ্রান্সে তখন চলছে ত্রাসের

রাজত্ব। এ সময়ে যে-অসংখ্য নরনারী গিলোটিনের শিকার হয়েছিল আঁদ্রের বাবা ছিলেন সে-সব হতভাগ্যদের অন্যতম।

বাবার শোচনীয় মৃত্যুতে আঁদ্রে রাতারাতি বদলে গেলেন। বাবাকে আঁদ্রে খুব ভালবাসতেন। ছোটবেলা থেকে বাবাই ছিলেন তাঁর সঙ্গী। আঁদ্রের বাবা শিশু আঁদ্রের মধ্যে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই আঁদ্রের প্রতিভার পূর্ণবিকাশের সমস্ত সুযোগ

বিপ্লবী সৈনিকেরা আঁদ্রের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে

করে দেবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। আঁদ্রের পড়াশুনোয় তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি আঁদ্রেকে ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষার পাঠ দিতেন। তবে, এসব প্রাচীন ভাষা শেখার ব্যাপারে আঁদ্রের তেমন উৎসাহ ছিল না। তিনি ভালবাসতেন গণিত-শাস্ত্র। এ ব্যাপারে তাঁর বাবা অবশ্য তাঁকে বিশেষ সাহায্য করতে পারতেন না। তবে তিনি আঁদ্রেকে গণিতশাস্ত্রের বহু মূল্যবান বই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আঁদ্রে নিজের চেষ্টাতেই অঙ্ক শিখতে লাগলেন। কিন্তু আঁদ্রে যখন দেখলেন যে, গণিতের সমস্ত ভাল বই

ল্যাটিন ভাষায় লেখা তখন তিনি বাধ্য হয়েই ল্যাটিন ভাষাটা শিখে ফেললেন।

তাঁর বাবা মারা যাবার পর তাঁদের সংসারের হাল তাঁকেই ধরতে হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রদের অঙ্ক শিখিয়ে তিনি রোজগার করতে লাগলেন। গৃহশিক্ষকতা করে যেটুকু সময় পেতেন সেটুকু তিনি ব্যয় করতেন নিজের পড়াশুনোয়। গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন—এ তিনটি বিষয়েই তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

কুড়ি বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন এবং এর কিছুদিন পরই লিয়োঁ শহরের একটি স্কুলে তিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু তখনও প্রধানত গণিত নিয়েই তিনি মৌলিক চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি 'জুয়াখেলার গণিত প্রসঙ্গে' (Considerations of the Mathematics of Gambling) নামে একটি বই লেখেন। এ বইতে তিনি অঙ্ক কষে দেখান যে, যদি কোন জুয়াড়ী জুয়াখেলা চালিয়ে যেতে থাকে তবে শেষ পর্যন্ত সে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। তাঁর বইটির বিষয় তেমন কৌলীন্যসম্পন্ন ছিল না, কিন্তু আম্‌পিয়ের বইটিতে যে-ভাবে গাণিতিক যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছিলেন তাতে তখনকার দিনের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞরা যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে আমপিয়ের-এর জীবনে আর এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি নেমে এলো। তাঁর স্ত্রী অকালে মারা গেলেন। আম্‌পিয়ের-এর বয়স তখন উনত্রিশ বছর। স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছর পর বিষণ্ণ আম্‌পিয়ের বিজ্ঞানী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গুণগ্রাহী ছিল অসংখ্য। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ। ওয়রস্টেডের গবেষণাপত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন আম্‌পিয়ের ছিলেন প্যারিসের এই পলিটেকনিক স্কুলের অধ্যাপক। ওয়রস্টেডের আবিষ্কারের কথা জানতে পেয়ে আম্‌পিয়ের তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন।

তিনি আবিষ্কার করেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে ঐ তারের চারপাশে চৌম্বক প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ, তড়িৎ-বাহী তারের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়। তিনি

লক্ষ্য করেন যে, পাশাপাশি রাখা দুটো সমান্তরাল তারের মধ্য দিয়ে সমমুখী তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে তার দুটো পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং যদি এই দুই তারের মধ্য দিয়ে বিপরীতমুখী তড়িৎ-প্রবাহ যায় তবে তার দুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এর পর তিনি তড়িৎ-প্রবাহের মান এবং তার দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্বের সঙ্গে তার দুটোর পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ-বলের সম্পর্কের একটি গাণিতিক সমীকরণ নিরূপণ করেন। তাঁর সমীকরণটি ছিল নির্ভুল। এখনও বিজ্ঞানীরা এ সমীকরণ ব্যবহার করেন।

আম্‌পিয়ের আরও দেখান যে, তড়িৎ-বাহী তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রটি বৃত্তীয়। এ থেকে আম্‌পিয়ের অনুমান করেন যে, তড়িৎ-বাহী তারকে বেঁকিয়ে যদি বৃত্তাকার করা যায় তবে ঐ বাঁকানো তারের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা বাড়বে। তিনি পরীক্ষা করে তাঁর এই ধারণা যাচাই করে দেখলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো, তাঁর এ ধারণা অভ্রান্ত। এর পর আমপিয়ের তড়িৎ-বাহী তারকে বহুসংখ্যক পাকবিশিষ্ট কুণ্ডলীর আকারে জড়িয়ে ঐ কুণ্ডলীর কেন্দ্রে তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এর পর আমপিয়ের কৃত্রিম চুম্বক নির্মাণের পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন তড়িৎ-বাহী কুণ্ডলীর মধ্যে একটি লোহার দণ্ড স্থাপন করলে দণ্ডটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন চুম্বকে পরিণত হয়। প্রকৃতিলব্ধ চুম্বকের তুলনায় এরূপ কৃত্রিম চুম্বক বেশি শক্তিশালী। এই কৃত্রিম চুম্বককে তড়িচ্চুম্বক (electromagnet) বলা হয়। আম্‌পিয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এও লক্ষ্য করেন যে, এরূপ কৃত্রিম চুম্বক তৈরীতে কাঁচা লোহার দণ্ডই বেশি সুবিধাজনক। কুণ্ডলীর মধ্যে কাঁচা লোহার একটি দণ্ড রেখে কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। বৈদ্যুতিক বর্তনী ছিন্ন করে কুণ্ডলীর তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডটির চুম্বকত্ব লোপ পায়। অর্থাৎ, তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে কাঁচা লোহার দণ্ডটি একটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। আম্‌পিয়ের দেখেন যে, কাঁচা লোহার পরিবর্তে ইস্পাতের দণ্ড নিলে তাকে চুম্বকে পরিণত করতে অপেক্ষাকৃত বেশি মানের তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া, ইস্পাতদণ্ড একবার চুম্বকিত হলে কুণ্ডলীর তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হলেও ঐ দণ্ডের চুম্বকত্ব লোপ পায় না।

অর্থাৎ, তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ইস্পাতদণ্ডটি একটি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়।

তড়িচ্চুম্বকের আবিষ্কারকেই তড়িৎ-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের সূচনা বলা যায়। তড়িচ্চুম্বক আবিষ্কারের পরই মানবকল্যাণে বিদ্যুতের ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দিল। বর্তমানে নানান বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তড়িচ্চুম্বক ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুতের উৎপাদনেও তড়িচ্চুম্বক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আমরা নানান প্রয়োজনে তড়িচ্চুম্বক ব্যবহার করি। বাড়ির দরজায় এসে কোন আগন্তুক বোতাম টিপে যে-বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজায়, টেলিফোন কল এলে যে-ঘণ্টা ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে তাদের ক্রিয়া তড়িচ্চুম্বকের ধর্মের ওপর নির্ভর করে। তড়িচ্চুম্বকের নানান ব্যবহার আছে, কিন্তু এর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যবহার বোধকরি তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে বার্তা প্রেরণ। বার্তা প্রেরণের এ পদ্ধতির নাম টেলিগ্রাফি।

চিত্রকর মোর্স এবং তাঁর উদ্ভাবন

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবরাখবর যেতো চিঠি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে। এসব চিঠি এবং সংবাদপত্রকে স্থানান্তরে পাঠানোর উপায় ছিল যাত্রীবাহী গাড়ি (মূলত ঘোড়ার গাড়ি)। এই সব গাড়ি দ্রুতগামী ছিল না। তাই সে-সময় দূরবর্তী কোন স্থান থেকে সংবাদ এসে পৌঁছোতো বেশ কিছু দিন, সপ্তাহ বা মাস পর। লিখিত বা মুদ্রিত কাগজকে যে-দ্রুততায় স্থানান্তরে পাঠানো যেতো সংবাদ বা বার্তাও তখন যেতো সেই দ্রুততায়, কেননা তখনও বার্তা-প্রেরণের কোন দ্রুততর বিকল্প পদ্ধতি মানুষের করায়ত্ত হয় নি। এ মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে যে-ঘটনা ঘটে

যাচ্ছে সে-ঘটনার বিবরণ তৎক্ষণাৎ হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না? যদি তা সম্ভবপর হতো তাহলে বেশ হতো। প্রবাসী প্রিয়জনের কথা ভেবে মানুষ মনে মনে বহু যুগ থেকে এ কামনা করে এসেছে।

দ্রুত বার্তা-প্রেরণের কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় না? অনেকেই এ সম্ভাবনার কথা ভাবতেন। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এ নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রয়াস সফল হয় নি। শুনলে অবাক হতে হয় যে, বিদ্যুতের সাহায্যে বার্তাপ্রেরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যিনি সফল হয়েছিলেন তিনি পেশায় বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। তাঁর নাম ছিল স্যামুয়েল ফিন্‌লে ব্রিশ মোর্স। চিত্রশিল্পী হিসেবে আমেরিকায় মোর্সের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁদের ছবি আঁকানোর জন্য মোর্সের কাছে আসতেন। এমন কি প্রেসিডেন্ট জেমস মোন্‌রো-ও তাঁকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকিয়েছিলেন।

১৮১০ খ্রীস্টাব্দে ওয়েল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে মোর্স তাঁর বাবার কাছে চিত্রকর হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন যাজকসঙ্ঘের পরিচালক। ছেলে চিত্রকর হতে চায় শুনে তিনি কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে কোন অর্থকরী পেশা বেছে নিক। কিন্তু মোর্সের আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা আর আপত্তি করলেন না। চিত্রশিল্পের পাঠ নেবার জন্য তাঁকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এসময় তাঁর বাবা তাঁকে খুব বেশি আর্থিক সাহায্য করতে পারতেন না বলে লণ্ডনে কয়েকবছর তাঁকে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও মোর্স এ সময় কঠোর পরিশ্রম করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে লাগলো। তিনি যখন লণ্ডন থেকে দেশে ফিরলেন তখন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী। চিত্রকলায় ইতালীর অবিস্মরণীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকরদের শিল্পকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইতালী যান। ইতালীতে কয়েকটি সফল বছর কাটানোর পর তিনি আমেরিকায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে 'স্লী' (Sully) নামে একটি জাহাজে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। এ সমুদ্রযাত্রা যে কেবল মোর্সের

জীবনটাই বদলে দিয়েছিল তাই নয়, মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারাও বদলে দিয়েছিল।

জাহাজের ডাইনিং টেবিলে বসে মোর্সের সহযাত্রীদের কয়েকজন বিদ্যুৎ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে বার্তা প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম পদ্ধতি উদ্ভাবনের যে-সব চেষ্টা হয়েছে সে-সব নিয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তড়িৎ-বিজ্ঞানে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। তাঁরা নানান যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিচ্ছিলেন এবং কোন্‌টি কেন শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ কাজ করে নি সে-সম্পর্কেও মতামত দিচ্ছিলেন। পাশে বসে মোর্স তাঁদের আলোচনা মন দিয়ে শুনছিলেন। বিদ্যুৎ সম্পর্কে তিনি তখন বিশেষ কিছুই জানেন না। কেবল এটুকু জানতেন যে, বিদ্যুৎ এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় শক্তি যাকে কাজে লাগাতে পারলে মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করতে
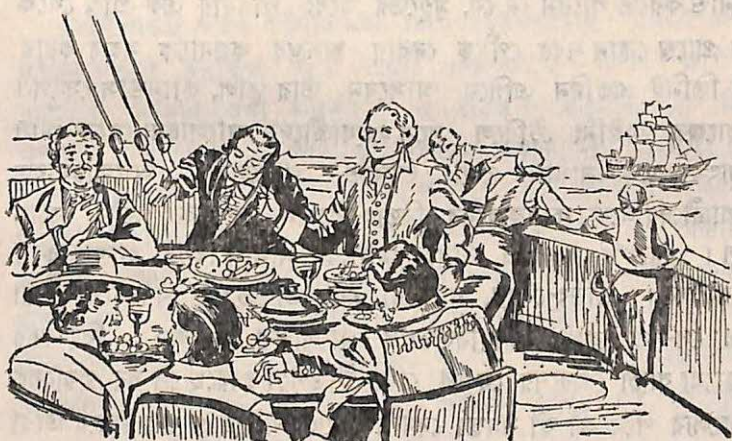
জাহাজের ডাইনিং টেবিলে বসে বিদ্যুৎ সম্পর্কে সহযাত্রীদের আলোচনা শুনছেন চিত্রকর স্যামুয়েল ফিন্‌লে মোর্স।

পারবে। ডাইনিং টেবিলে বসে সহযাত্রীদের কথাবার্তা শুনে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি না? চেষ্টা করলে কি আমি টেলিগ্রাফ পদ্ধতি উদ্ভাবনে সফল হতে পারি না?' যদি বিদ্যুতের গতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর পাঠানো যেতো! মোর্সের মনে পড়লো কয়েক বছর আগেকার কথা।

তিনি সেদিন সবে আমেরিকা থেকে লণ্ডন এসে পৌঁছেছেন। লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি তাঁর বাবা-মাকে চিঠি লিখতে বসেছেন। মনে পড়লো, সেদিনের চিঠিতে তিনি তাঁর মা-বাবার কাছে লিখেছিলেন ঃ

'কালি-কলম হাতে নিয়ে বসেই এ অসম্ভব ইচ্ছা মনে জাগছে—এ মুহূর্তে যদি আমার মনের কথাগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম! অনুমান করতে পারছি, তোমরা আমার খবরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো এবং আমার নানান অনিষ্টের আশঙ্কার কথা ভেবে পীড়িত হয়ে আছো। আমি নির্বিঘ্ন আছি, সুস্থ আছি—এই সামান্য কথাটাও যদি এ মুহূর্তে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম! কিন্তু হায়, এ খবরটুকু তোমাদের কাছে অন্তত চার সপ্তাহ পর গিয়ে পৌঁছোবে।'

যেদিন মোর্স তাঁর চিঠিতে এসব কথা লিখছিলেন সেদিন মোর্স কল্পনাও করতে পারেন নি যে, মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোন খবর পৌঁছে দেবার অসম্ভব কল্পনাকে সম্ভব করার জন্য তিনিই একদিন এগিয়ে আসবেন তাঁর তুলি, ক্যানভাস ফেলে। জাহাজের ডাইনিং টেবিলে বসে সহযাত্রীদের আলোচনা থেকে মোর্স বিদ্যুৎ-সম্পর্কে নানান কথা জানতে পারলেন। আলোচনারত সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল। মোর্সের আগ্রহে তাঁরা মোর্সকে নানান বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তড়িৎ-কোষ, ব্যাটারী এবং তড়িচ্চুম্বক কীভাবে ক্রিয়া করে সে-সব কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। বিদ্যুতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণের যে-সব চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে সে-সব প্রয়াসের সাফল্যের পথে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে মোর্সের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা সে-সব কথাও বুঝিয়ে বললেন। মোর্স মন দিয়ে তাঁদের কথা শুনলেন এবং বিদ্যুতের নানান সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারলেন।

ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে নিজের কেবিনে এসে ঢুকলেন মোর্স। তাঁর মাথায় একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। হয়তো তাঁর এ ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে বিদ্যুতের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে দুর-দূরান্তে বার্তা পাঠানো যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানে আনাড়ি একজন চিত্রকরের পক্ষে এমন সাফল্য আশা করা কি ধৃষ্টতা নয়? তড়িৎ-বিজ্ঞানের

বিশেষজ্ঞরা বহু চেষ্টা করেও যে-বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তিনি সে-বিষয়ে সফল হতে পারবেন কি? হয়তো দুরাশা। কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এর পর কয়েকদিন তিনি আর জাহাজের কেবিন থেকে বেরোনোর ফুরসৎ পেলেন না। টেলিগ্রাফ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা যাচাই করার জন্য নানান চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন, সম্ভাব্য যান্ত্রিক ব্যবস্থার নক্সা আঁকতে লাগলেন। কয়েক-দিনের চেষ্টায় তিনি বিদ্যুতের সাহায্যে সংকেত-পাঠানোর একটি পদ্ধতির পরিকল্পনা রচনা করতে সক্ষম হলেন। তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি ছিল তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তাঁর এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি? প্রস্তাবিত যন্ত্রটি তৈরী করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে তা জানা যাবে না। মোর্স স্থির করলেন, আমেরিকায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি তাঁর পরিকল্পিত পদ্ধতিটির কার্যকারিতা যাচাই করে দেখবেন।

মোর্স একটি সংহত বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে একটি তড়িচ্চুম্বককে চুম্বকিত করে একটি পেন্সিলকে সচল কাগজের সংস্পর্শে আনার কথা ভাবেন। এ ব্যবস্থায় বর্তনীর মধ্য দিয়ে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে কাগজে একটি 'ডট্' (dot) এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে কাগজে একটি 'ড্যাশ্' (dash) আঁকা হবে। মোর্স এরূপ ড্যাশ্ এবং ডটের বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে ইংরাজী বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণকে এবং বিভিন্ন সংখ্যাকে প্রকাশ করার একটি 'কোড্' স্থির করেন। একে বলা হয় 'মোর্স কোড'। তাঁর জাহাজ আমেরিকা পৌঁছোনোর আগেই মোর্স জাহাজের নিঃসঙ্গ কেবিনে বসে টেলিগ্রাফি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন এবং প্রাসঙ্গিক নানান খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।

আমেরিকায় পৌঁছেই মোর্স তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। চিত্রকর মোর্স তাঁর তুলি, ক্যানভাস, ইজেলের কথা ভুলে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডুবে রইলেন। তাঁর উদ্ভাবনা কার্যকরী হবে—এ সম্পর্কে মোর্স নিশ্চিত ছিলেন। তাই সফল চিত্রকর হয়েও তিনি ছবি আঁকার সমস্ত লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন তিনি ডুবে রইলেন ব্যাটারী, তার, কাঁচা লোহার দণ্ড, লিভার ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু সাফল্যের পথ

খুব সহজ হলো না। মোর্সের উদ্ভাবিত প্রথম যন্ত্রটি কাজ করলো না। কিন্তু তিনি এতে হতোদ্যম হলেন না। দিনের পর দিন তাঁর যন্ত্রের নানান পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। বিদ্যুতের সাহায্যে তাঁর গবেষণাগারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বার্তা প্রেরণে সক্ষম হলেন তিনি। কিন্তু এতেই মোর্সের সব সমস্যার সমাধান হলো না। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির কার্যকারিতা দেখানোর জন্য যে-বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা জোগাড় করা মোর্সের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কয়েক মাইল দূরে বৈদ্যুতিক বার্তা পাঠিয়ে দেখতে হলে প্রথমেই কয়েক মাইল লম্বা তারের প্রয়োজন হবে। ধাতব তার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির দাম খুব কম ছিল না। যাদের অর্থ আছে তারাও কোন অনিশ্চিত ব্যাপারে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত। কাজেই, মোর্স নিজের অর্থ খরচ করেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। এসময় তিনি ছবি এঁকেও কোন অর্থ উপার্জন করতে পারছিলেন না। কেননা সময়ের অভাবে তিনি ছবি আঁকার কোন কাজই নিচ্ছিলেন না।

পরিণত বয়সে বিজ্ঞানী মোর্স

বছরের পর বছর মোর্স তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফির প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য অর্থ সাহায্য লাভের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু অর্থ সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে এলো না। দারিদ্র্য এবং হতাশার ভ্রূকুটিতে তাঁর জীবন তখন দুর্বিষহ। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হাসি হাসলেন। কয়েকজন সিনেটর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি মোর্সের উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, মোর্সের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি সফল হলে তা হবে বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী সাফল্য।

তাঁদের সুপারিশে মোর্স তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি প্রদর্শনের জন্য সরকারী সাহায্য লাভ করতে সক্ষম হলেন।

ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর। এই দুই শহরের মধ্যে চল্লিশ মাইল লম্বা তারের লাইন স্থাপন করা হলো ২৪-এ মার্চ, ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে। ঐ দিন মোর্স সরকারের মনোনীত বিশেষজ্ঞদের সামনে তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফি পদ্ধতির বাস্তবতা প্রমাণ করে দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। মোর্স ছিলেন চল্লিশ মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইনের ওয়াশিংটন প্রান্তে এবং মিঃ ভেইল নামে তাঁর এক সহকারী ছিলেন বাল্টিমোর প্রান্তে। ঠিক হলো, মোর্স ওয়াশিংটন থেকে একটি বার্তা পাঠাবেন বাল্টিমোরে এবং মিঃ ভেইল বাল্টিমোর থেকে সেই বার্তাই আবার পাঠাবেন ওয়াশিংটনে।

মোর্স তাঁর মেশিনের সামনে গিয়ে বসলেন। দর্শকেরা নিঃশব্দে তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলো। মোর্সের যন্ত্র থেকে শব্দ উঠতে লাগলো—'ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্'। মোর্স তাঁর উদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায় বাল্টিমোরে বার্তা পাঠালেন, "What hath God wrought ?" মোর্স বার্তা পাঠানো শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। মোর্সের পাঠানো বার্তা বাল্টিমোরে গৃহীত হয়েছে তো ? বার্তাটি বাল্টিমোর থেকে ফিরে আসবে তো ?

দর্শকেরা গভীর উত্তেজনা নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল। আর, ঠিক সে-মুহূর্তেই মোর্সের গ্রাহক যন্ত্রটি সরব হয়ে উঠলো। গ্রাহক যন্ত্রের পেন্সিলটি কাগজের উপর এঁকে চললো—ডট্-ড্যাশ্-ড্যাশ। অর্থাৎ ইংরাজি অক্ষর 'W'। এর পর কাগজের উপর ফুটে উঠলো—'ডট্-ডট্-ডট্-ডট্', অর্থাৎ, ইংরাজি অক্ষর 'H'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র বার্তাটি সাংকেতিক ভাষায় গ্রাহক যন্ত্রের কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, 'What hath God wrought ?' সেই সঙ্গে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হলো। মোর্সের স্বপ্ন এখন বাস্তব। মানুষ এখন বিদ্যুৎ-গতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বার্তা পাঠাতে পারে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার বিভিন্ন শহরের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হলো। এর পর অন্যান্য দেশেও টেলিগ্রাফির ব্যবহার চালু হলো। চিত্রকর মোর্সের চেষ্টায় বিদ্যুতের এক অত্যাশ্চর্য ব্যবহার মানুষের আয়ত্ত হলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

গ্রাহাম বেল এবং তাঁর উদ্ভাবিত টেলিফোন

মানুষ তারের মধ্য দিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বার্তা পাঠাতে শিখলো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতেও তৃপ্ত হলেন না। তাঁরা উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। টেলিগ্রাফ লাইনের মধ্য দিয়ে একই সময়ে একাধিক বার্তা পাঠানো যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল নামে একজন যুবক। গ্রাহাম বেল টেলিগ্রাফির উন্নতি সাধনে সফল হন নি, তবে এ উদ্দেশ্যে গবেষণা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তিনি একটি উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। তাঁর ধারণা হলো, বিদ্যুতের সাহায্যে তারের মধ্য দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর পাঠানো যাবে দূরে-দূরান্তে।

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা এবং ঠাকুরদা—দু'জনেই ছিলেন ভাষাতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বের শিক্ষক। বিজ্ঞানের পাঠ নেবার সঙ্গে সঙ্গে বেল তাঁর বাবার কাছ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর, ধ্বনি ও তার প্রক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

বেল-এর দু'ভাই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যখন বেল-এর শরীরেও এ রোগের লক্ষণ দেখা দিল তখন তাঁর বাবা-মা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে বসবাস করা মনস্থ করেন এবং স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে দিয়ে কানাডার ওণ্টারিও শহরে চলে আসেন। কানাডার জল-হাওয়ায় বেল-এর স্বাস্থ্য ফিরলো। কিছুদিন পরই তিনি বোস্টনে চলে যান এবং সেখানে একটি স্কুলে ভাষাতত্ত্বের শিক্ষকের পদে যোগ দেন। বোস্টনে শিক্ষকতা করার সময়েই তিনি টেলিগ্রাফি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে এ বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর বাড়ির দুটো ঘরে গবেষণাগার তৈরী করে নিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু টমাস ওয়াটসনের সঙ্গে

অবসর সময়ে তিনি টেলিগ্রাফি সম্পর্কিত গবেষণার কাজ করতেন। একদিন মিঃ ওয়াটসন একটি ঘরের টেলিগ্রাফ প্রেরক-যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। অন্য ঘরে গ্রাহাম বেল টেলিগ্রাফ গ্রাহক যন্ত্রের সামনে বসে ছিলেন। ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, প্রেরক যন্ত্রের একটি ধাতব পাত আশানুরূপ কাজ করছে না। তিনি পাতটিকে বার দুই টেনে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেল সে-ঘরে এসে ঢুকলেন এবং উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়াটসন, তুমি কী করছিলে, বলো তো? আমি গ্রাহক যন্ত্রে খট্-খট্ আওয়াজ শুনতে পেলাম।' ওয়াটসন আশ্চর্য হলেন বন্ধুর কথা শুনে। তারপর বললেন যে, তিনি ধাতুর পাতটিকে বার দুই টেনে ছেড়ে দিয়েছিলেন মাত্র। কৌতূহলী হয়ে বেল বললেন, 'আমি ও ঘরে যাচ্ছি। তুমি আবার পাতটাকে একই ভাবে টেনে ছেড়ে দাও তো।' বেল অন্য ঘরে গিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রের সামনে বসলেন। ওয়াটসন পাতটাকে টেনে ছেড়ে দিলেন। 'খট্' করে একটা শব্দ ধরা পড়লো গ্রাহক যন্ত্রে। গ্রাহাম বেল বুঝলেন যে, আকস্মিক ভাবে তাঁরা একটি অসাধারণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন গ্রাহাম বেল, 'ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে বাজি রেখে বলতে পারি যে, বিদ্যুতের সাহায্যে তারের মধ্য দিয়ে আমি যে-কোন রকম শব্দকে পাঠাতে পারবো।' গ্রাহাম বেল জানতেন যে, যদি কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে কোন লোহার পাত স্পন্দিত হতে থাকে তবে এই স্পন্দনের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে। কোন তড়িচ্চুম্বকের সামনে কোন পাতলা পাত বা ডায়াফ্রাম কম্পিত হতে থাকলে তড়িচ্চুম্বকের চৌম্বক-ক্ষেত্র পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী এবং দুর্বল হতে থাকে। বেল তাঁর ইলেকট্রিক স্পীচ্ মেশিনে এই নীতি কাজে লাগিয়েছিলেন।

যখন কোন ব্যক্তি প্রেরক যন্ত্রের সামনে কথা বলে তখন উৎপন্ন শব্দ-শক্তির প্রভাবে তড়িচ্চুম্বকের কাছে রাখা একটি ডায়াফ্রাম কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত হতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের ফলে একটি কুণ্ডলীর তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনশীল এই তড়িৎ-প্রবাহ ইলেকট্রিক স্পীচ্ মেশিনের গ্রাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্পষ্টতই, এই তড়িৎ-প্রবাহের প্রকৃতি বক্তার কণ্ঠস্বরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। গ্রাহক যন্ত্রে এই পরিবর্তনশীল তড়িৎ-প্রবাহকে অন্য একটি তড়িচ্চুম্বকের মধ্য

দিয়ে পাঠানো হয়। অর্থাৎ, বক্তার কণ্ঠস্বরের প্রভাবে প্রেরক যন্ত্রের ডায়াফ্রাম যে-ভাবে কম্পিত হয়, চৌম্বক ক্ষেত্রের উক্ত পরিবর্তনের ফলে এই তড়িচ্চুম্বকের সন্নিকটবর্তী একটি ডায়াফ্রাম ঠিক একই ভাবে কম্পিত হতে থাকে। কাজেই, বক্তার কণ্ঠস্বর বায়ুতে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে গ্রাহক যন্ত্রে কম্পমান ডায়াফ্রামটিও বায়ুতে ঠিক একই রকম শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে।

এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বেল এবং ওয়াটসন দীর্ঘদিন ধরে একটি ইলেকট্রিক স্পীচ মেসিন উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলো সফল হলো না। কিন্তু তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন না। নানান অসাফল্যের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁদের যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করতে লাগলেন। এবং একদিন আকস্মিকভাবেই তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ। ঐ দিন বেল তাঁর ইলেকট্রিক স্পীচ মেশিনের প্রেরক যন্ত্র নিয়ে একটি ঘরে কাজ করছিলেন। তাঁর সহকারী গ্রাহক যন্ত্রটির সামনে বসে ছিলেন অন্য ঘরে। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ ছিল। টেবিলের উপরে ছিল একটা ব্যাটারী, বেল-এর অসতর্কতায় হঠাৎ তাঁর হাতে লেগে ব্যাটারীটা টেবিল থেকে পড়ে গেল এবং অ্যাসিড ছিট্‌কে বেরিয়ে কিছুটা পড়লো মেঝের উপর, আর কিছুটা পড়লো তাঁর পোশাকের উপর।

'মিঃ ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি এসো।' বেল চিৎকার করে ডাকলেন!

ওয়াটসন অন্য ঘরে ছিল। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ ছিল বলে ব্যাটারীর পড়ে যাবার শব্দটা ওয়াটসন শুনতে পায় নি। তবে, তাঁর মনে হলো, ইলেকট্রিক স্পীচ মেশিন থেকে বেল-এর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, 'মিঃ ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি এসো।' ওয়াটসন বিস্মিত এবং উত্তেজিত হয়ে ছুটে পাশের ঘরে এসে ঢুকলেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'মিঃ বেল, আমাদের স্পীচ মেসিন কাজ করছে। রিসিভারে আমি তোমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছি।' এ কথা শুনে উত্তেজনায় বেল মেঝেতে পড়ে যাওয়া ব্যাটারীর কথা, তাঁর পোশাকের অ্যাসিডের কথা ভুলে গেলেন। এর পর কিছুক্ষণ মিঃ বেল এবং মিঃ ওয়াটসন তাঁদের স্পীকিং মেশিনের মধ্য দিয়ে বার্তা পাঠাতে লাগালেন। একবার মিঃ ওয়াটসন বলেন মিঃ বেল শোনেন, আর একবার মিঃ বেল বলেন মিঃ

ওয়াটসন শোনেন। তাদের স্পীচ মেশিন কাজ করছে! শেষ পর্যন্ত সত্যিই বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর পাঠানো সম্ভবপর হলো!

ওয়াটসন বিস্মিত এবং উত্তেজিত হয়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকলেন

গ্রাহাম বেল-এর উদ্ভাবিত স্পীকিং মেশিনই প্রথম টেলিফোন। এ যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেই আধুনিক টেলিফোন নির্মিত হয়েছে।

আমেরিকার স্বাধীনতালাভের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফিলাডেলফিয়াতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল তাঁর উদ্ভাবিত টেলিফোন নিয়ে এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার দেবার উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত যন্ত্রাদির বিচারের দিনটি ছিল একটি রবিবার। সেদিন প্রদর্শনীতে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কেবল কিছু সংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি এবং বিচারকেরাই সেদিন প্রদর্শনীতে প্রবেশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রেজিলের সম্রাট ডম্ পেড্রো। তিনি এ সময় আমেরিকা সফরে এসেছিলেন। বিচারকেরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রদর্শিত বস্তু দেখতে লাগলেন। বেলা গড়িয়ে যেতে লাগলো। নিদারুণ গ্রীষ্মে বিচারকেরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বেল জানতে পারলেন,

বিচারকেরা সব কিছু দেখে উঠতে পারবেন না। এও জানতে পারলেন যে, তাঁর টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় বিচারকদের হবে না। হতাশ হয়ে বেল প্রদর্শনীর হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলেন, 'মিঃ বেল!' ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সম্রাট পেড্রো এগিয়ে আসছেন হাসিমুখে। করমর্দন করে বললেন, 'চলুন, আপনার যন্ত্রটা দেখবো।' সম্রাট পেড্রো ছিলেন বেলের পূর্ব-পরিচিত। বোস্টনে বেল যে-স্কুলে পড়াতেন সম্রাট একবার সে-স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সে সময় বধির ছাত্রদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বেলের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সম্রাট পেড্রো সে সব কথা ভুলে যান নি। বেলকেও তাঁর মনে ছিল।

বেল-এর টেলিফোন যন্ত্রটি দেখে সম্রাট পেড্রো বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। তিনি বিচারকদের ডাকলেন। বেল-এর উদ্ভাবিত আশ্চর্যজনক যন্ত্রটি দেখে বিচারকমণ্ডলীও বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। চোখে দেখেও যেন তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই একে একে টেলিফোনে কথা বললেন এবং রিসিভারে কান পেতে শুনলেন। এর পর বিচারকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হলো না। বেলের উদ্ভাবিত টেলিফোন প্রথম পুরস্কার পেলো।

একথা সত্য যে, ফিলাডেলফিয়াতে যে টেলিফোন যন্ত্রটি প্রদর্শিত হয়েছিল তা আজকের টেলিফোনের মত উন্নত ছিল না। আজ টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায়। টেলিফোন উদ্ভাবিত হওয়ার পর এ যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্তু মূল নীতির দিক থেকে বেলের আদি টেলিফোনের সঙ্গে আধুনিক টেলিফোনের কোন পার্থক্য নেই।

মাইকেল ফ্যারাডে এবং তাঁর মূল্যবান আবিষ্কার

ভোল্টীয় ব্যাটারীর সাহায্যেই মোর্স এবং বেলের আবিষ্কার সম্ভবপর

হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটারীর থেকে যে-হারে শক্তি পাওয়া যায় তা খুবই সীমিত। শিল্পক্ষেত্রে তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার প্রচলিত হবার জন্য অনেক তড়িৎ-উৎসের প্রয়োজন ছিল। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তড়িৎ-উৎস উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে ইংরেজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কৃত একটি সূত্রের ভিত্তিতে।

মাইকেল ফ্যারাডে যখন প্রথম বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। ফ্যারাডের পরিবার ছিল দরিদ্র। তাই ঐ বয়সেই ফ্যারাডেকে চাকুরীর সন্ধানে বেরোতে হয়েছিল। তিনি একটি বই-এর দোকানে ফাই-ফরমাস খাটার কাজ পেয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, তাঁর মনিব মিঃ রিবো বালক ফ্যারাডের উপর সদয় ছিলেন। বছর খানেক বাদে মিঃ রিবো ফ্যারাডেকে বই-বাঁধার কাজ শেখার শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু বই-এর মলাটের চেয়ে বই-এর ভেতরের বিষয়বস্তুর প্রতিই ফ্যারাডের অনুরাগ ছিল বেশি। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। তাই বিজ্ঞান বিষয়ে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে, যে সব বই বাঁধাতে আসতো ফ্যারাডে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সব বই পড়ে ফেলতেন।

একদিন একজন খদ্দের মিঃ রিবোর সঙ্গে কথা বলছিল। মাইকেল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্যার হামফ্রে ডেভি রয়েল ইনস্টিটিউটে বিদ্যুৎ সম্পর্কে যে সব চমকপ্রদ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন খদ্দেরটি সে সম্পর্কে বলছিল। তারপর বললো, মিঃ রিবো, আজ সন্ধ্যায় ডেভির বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি। আমার কাছে একটি অতিরিক্ত টিকিট আছে। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। কাজেই, বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা আমি উপভোগ করতে পারবো না।' তারপর মাইকেলকে দেখিয়ে মিঃ রিবো বললো, 'আপনি বরং এই ছেলেটিকে নিয়ে যান। বিজ্ঞানে ওর গভীর আগ্রহ আছে। আমার দোকানে, তড়িৎ-বিজ্ঞান বিষয়ে যতো বই আছে সবই ওর পড়া হয়ে গেছে।'

মাইকেল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ রিবোর দিকে। খদ্দেরটি বললো, বেশ তো। ওকেই সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

অপ্রত্যাশিতভাবে বিশিষ্ট এক বিজ্ঞানীর বক্তৃতা শোনার সুযোগ

পেয়ে মাইকেল খুব আনন্দিত হলেন। সেদিন এবং আরও তিনদিন সন্ধ্যায় মাইকেল ডেভির বক্তৃতা শুনলেন। বালক মাইকেল গভীর মনোযোগ সহকারে প্রতিটি বক্তৃতা শুনলেন। সযত্নে প্রতিটি বিষয়ের নোট নিলেন এবং অবসর সময়ে বিস্তারিতভাবে ডেভির বক্তৃতার প্রতিটি খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করলেন। সঙ্গে নিজস্ব কিছু ধারণাও লিখে রাখলেন। লেখা শেষ করে তিনি তাঁর নোটগুলোকে বাঁধিয়ে নিলেন।

কিছুদিন পরে মাইকেল ফ্যারাডের শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হয়ে গেল। মাইকেল নতুন কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য হলেন। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি বই বাঁধাই-এর একটি কাজ পেয়েও গেলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর নতুন মনিব মিঃ রিবোর মতো সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সদয় নয়, নতুন কাজে ফ্যারাডে আগের মতো পড়াশুনো করার সুযোগ পেতেন না। এই কারণে এবং নতুন মনিবের রুক্ষ ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি স্থির করলেন যে, বই বাঁধাই-এর কাজ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু মনের মতো কাজ পাবেন কোথায়? বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুসি হতেন, কিন্তু তেমন সুযোগ তাঁকে কে দেবে?

হঠাৎ স্যার হামফ্রে ডেভির কথা ফ্যারাডের মনে পড়লো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, এমন বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর মতো একজন বুক-বাইণ্ডারকে দিয়ে কী করবেন? কিছুদিন ভেবেচিন্তে তিনি স্থির করলেন, একবার চেষ্টা করে দেখবেন। ভাবলেন, ডেভিকে একটা চিঠি লিখে দেখাই যাক না।

ফ্যারাডে চিঠি লিখলেন ডেভির কাছে। তড়িৎ-বিজ্ঞানের উপর ডেভির চারটি বক্তৃতা শুনে তিনি যে-নোটগুলো তৈরী করেছিলেন সেগুলো তিনি বাঁধিয়ে রেখেছিলেন সযত্নে। চিঠির সঙ্গে এই বাঁধানো নোটগুলোও তিনি ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন ফ্যারাডে। দিন, সপ্তাহ, মাস কাটতে লাগলো, কিন্তু ডেভির কাছ থেকে কোন উত্তর এলো না। ফ্যারাডে হতাশ হলেন, ভাবলেন, ডেভির মতো বড়ো বিজ্ঞানী তাঁর মতো অতি সামান্য যুবকের চিঠি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? এমন দুরাশা না করাই তাঁর উচিত ছিল।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। লণ্ডন শহর আশু উৎসবের আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করছে। কিন্তু ফ্যারাডের মনে কোন আনন্দ নেই,

আশাহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিষণ্ণ দিন কাটছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী আর অপ্রসন্ন হয়ে থাকতে পারলেন না। খ্রীস্টমাস উৎসবের ঠিক আগের দিন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। ঐ দিন ফ্যারাডের কর্মস্থানের দরজায় একটি সুন্দর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। একটি লোক নেমে এলো এবং মাইকেল ফ্যারাডের খোঁজ করলো। ফ্যারাডে বেরিয়ে আসতেই লোকটা তাঁর হাতে একটি চিঠি দিল। চিঠিটা লিখেছেন স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভি! কী লিখেছেন বিজ্ঞানী ডেভি? ব্যগ্র হাতে খামটা খুলে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগলেন তিনি। ছোট্ট চিঠি। কিন্তু তা এক খনি আনন্দ বয়ে এনেছে ফ্যারাডের জন্য। ডেভি লিখেছেনঃ

> ‘আপনার আত্মবিশ্বাসের যে-প্রমাণ আপনি দিয়েছেন তাতে আমি খুসি হয়েছি। এতে আপনার গভীর আগ্রহ, স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগেরও সাক্ষ্য মেলে। আমাকে কিছুদিনের জন্য লণ্ডনের বাইরে যেতে হচ্ছে। জানুয়ারির শেষ দিকের আগে শহরে স্থায়ী হতে পারবো না। এর পর যে-কোন সময় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। আমি যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে আমি খুসি হবো। আমি চাই তা যেন আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকে। .....’

ফ্যারাডে বার বার পড়লেন চিঠিটা। এর চেয়ে ভাল খ্রীস্টমাস্ উপহার আর কী হতে পারে ফ্যারাডের কাছে? এর পর ছুটির দিন যেন স্বপ্নের মতো কাটতে লাগলো। মন এখন অনেক হাল্কা লাগছে, আশা হচ্ছে, এ গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ডেভি কথা রেখেছিলেন, জানুয়ারির শেষ দিকে লণ্ডনে ফিরে এসেই তিনি মাইকেল ফ্যারাডেকে রয়েল ইনস্টিটিউটে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত ডেভির মতো বিজ্ঞানীর মুখোমুখি হয়ে মাইকেল রোমাঞ্চিত হলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এ সাক্ষাৎকারের ফল আশানুরূপ হলো না, ডেভির কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল না।

আবার হতাশায় ভেঙে পড়লেন ফ্যারাডে। বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার সুযোগ কি তিনি কখনো পাবেন না? সারা জীবন ধরেই কি তিনি বুক-বাইণ্ডার হয়ে থাকবেন? এমনি হতাশা ও মনোবেদনার মধ্য দিয়ে দিন যেতে লাগলো। কিন্তু মাসখানেক বাদে ডেভির আর একটি

চিঠি এলো ফ্যারাডের কাছে, ডেভি লিখেছেন, রয়েল ইনস্টিটিউটে একটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এর পদ খালি আছে, যদি ফ্যারাডে আগ্রহী হন তবে তিনি সে-পদে যোগ দিতে পারেন। ফ্যারাডে চিঠি পাওয়া মাত্র ডেভির সঙ্গে দেখা করলেন এবং ডেভির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে যোগ দিলেন। ফ্যারাডের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ সুগম হলো।

ডেভি তড়িৎ-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান বোধ করি মাইকেল ফ্যারাডেকে রয়েল ইনস্টিটিউ-টের পরীক্ষাগারে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া, ডেভি নিজেও একথা জানতেন। একজন সাংবাদিক ডেভিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার মতে আপনার সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার কী?'

দ্বিধাহীন কণ্ঠে ডেভি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার হলো মাইকেল ফ্যারাডে।'

চাকুরীতে যোগ দিয়ে ফ্যারাডে দেখলেন, ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখা, ফাই-ফরমাস খাটা ইত্যাদিও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তার জন্য ফ্যারাডের ক্ষোভ ছিল না। যে-পরিবেশ তিনি পছন্দ করেন সে-পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পেয়েই তিনি খুসি। তিনি নিজস্ব পড়াশুনো করার যথেষ্ট সময় পেতেন, সুযোগ-সুবিধা পেতেন নিজের ইচ্ছামতো নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার, ওয়রস্টেড এবং অ্যাম্পিয়ারের গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেগুলো পড়ে ফেললেন, উক্ত দুই বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ফ্যারাডে তড়িচ্চুম্বকত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং এ বিষয়ে নিজে নানান পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ওয়রস্টেড় এবং অ্যাম্পিয়ারের পরীক্ষাগুলো নিজে হাতে করে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন এবং এর পর নিজস্ব কয়েকটি মৌলিক ধারণা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বিজ্ঞানের কাজে ফ্যারাডের নিষ্ঠা এবং মৌলিকত্ব দেখে কিছু দিনের মধ্যেই ডেভি মুগ্ধ হলেন। এর পর থেকে তিনি ফ্যারাডেকে নানান বিষয়ে গবেষণার পথ-নির্দেশ করতে লাগলেন, যতো দিন যেতে লাগলো রয়েল ইনস্টিটিউটে ফ্যারাডের অবস্থার ততো উন্নতি হতে লাগলো। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট থেকে তিনি রয়েল ইনস্টিটিউটের সভ্য

পদে উন্নীত হলেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ডেভি মারা যান। ডেভির মৃত্যুর পর ফ্যারাডে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে থাকেন।

এ সময় থেকেই একটা ভাবনা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তড়িৎ যদি চুম্বকত্ব সৃষ্টি করতে পারে তবে চুম্বকত্ব থেকেই বা তড়িৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে না কেন? যদি তা সম্ভবপর হয় তবে হয়তো তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি বিকল্প পদ্ধতি পাওয়া যেতে পারে। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে একটি পরীক্ষাকালে ফ্যারাডে দেখলেন যে, তাঁর অনুমান অভ্রান্ত। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোন সংহত কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয়। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ আবিষ্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়েই বর্তমানে বৈদ্যুতিক জেনারেটর-এ বিপুল পরিমাণ তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-রত মাইকেল ফ্যারাডে

সে-সময় ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন স্যার রবার্ট পিল। ফ্যারাডে একদিন তাঁর উদ্ভাবিত তথ্যটি মিঃ পিল্‌কে বুঝিয়ে বললেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে দেখালেন যে, চুম্বকের সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। ফ্যারাডে একটি কুণ্ডলীর সঙ্গে একটি গ্যালভানোমিটার জুড়ে দিয়ে দেখালেন যে, কোন চুম্বককে ঐ কুণ্ডলীর সামনে নাড়ালে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়তে থাকে। ফ্যারাডের আবিষ্কার প্রধানমন্ত্রীর মনে দাগ কাটতে পারলো না, কেননা তিনি এ আবিষ্কারের যথার্থ তাৎপর্য এবং ব্যবহারিক গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। তাই ফ্যারাডের পরীক্ষা দেখে মিঃ পিল্ তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলেন, 'দেখতে পেলাম যে, চুম্বকটা নাড়ালে একটি কাঁটা নড়ছে। কিন্তু আপনার এ আবিষ্কার দেশের কী কাজে লাগবে?'

উত্তরে মাইকেল ফ্যারাডে বলেছিলেন, 'সদ্যজাত শিশু পরিণত বয়সে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। বলা যায় না, আমার এ আবিষ্কার হয়তো অনেক অসাধ্য সাধন করবে। হয়তো এ আবিষ্কারের তথ্য কাজে লাগিয়ে একদিন আপনার সরকার দেশবাসীর কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করবে।'

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্যারাডের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে যে-সব জেনারেটর বা ডায়নামোর সাহায্যে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয় সেগুলো ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশের ভিত্তিতে কাজ করে। তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ ছাড়াও তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। এদের মধ্যে তড়িৎ-বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত সূত্রাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তড়িৎ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দটি ছিল বিশেষ ফলপ্রসূ। ঐ বছরই ফ্যারাডে তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। নিউইয়র্ক-এর অ্যালবানী অ্যাকাডেমীর শিক্ষক জোসেফ হেনরি-ও নিরপেক্ষভাবে একই তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি তড়িচ্চুম্বকের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন এবং অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তড়িচ্চুম্বকত্ব আবিষ্কারে সক্ষম হন। ওয়েল কলেজ-এর ল্যাবরেটরির জন্য তিনি যে-তড়িচ্চুম্বকটি তৈরী করেছিলেন সেটি কেবলমাত্র ভোল্টীয় ব্যাটারীর সরবরাহিত তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যেই প্রায় ১৬০০ কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে তুলতে পারতো। কে প্রথম বৈদ্যুতিক জেনারেটর বা ডায়নামো তৈরী করেছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ফ্যারাডেই এ কৃতিত্বের দাবিদার। আবার অনেকের মতে মার্কিন বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরি ফ্যারাডের আগেই ডায়নামো তৈরী করেছিলেন।

বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরি

বর্তমানে বিভিন্ন মেশিন, বৈদ্যুতিক ট্রেন, ট্রামগাড়ি ইত্যাদি চালানোর জন্য, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি আলোকিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। এই বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আধুনিক পাওয়ার-হাউসে বিরাট আকারের জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। এসব জেনারেটরকে টারবাইনের সাহায্যে চালানো হয়। সাধারণত বাষ্পের শক্তিতে কিংবা জলের শক্তিতে টারবাইন ঘোরানো হয়। টারবাইন ঘুরলে আর্মেচার-কুণ্ডলীটি জেনারেটরের তড়িচ্চুম্বকটির তড়িৎ-ক্ষেত্রে দ্রুত ঘুরতে থাকে। ফলে আর্মেচার বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয়।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে বাষ্পচালিত টারবাইনের সাহায্যে এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জলশক্তিচালিত টারবাইনের সাহায্যে আর্মেচার ঘোরানো হয়। বাষ্পচালিত টারবাইনের ক্ষেত্রে সাধারণত কয়লা পুড়িয়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়। এই তাপ বয়লারের জলকে বাষ্পে পরিণত করে। উৎপন্ন বাষ্প যখন টারবাইনের ব্রেড-এ গিয়ে ধাক্কা দেয় তখন বাষ্পের গতিশক্তি টারবাইনে গতি সঞ্চার করে। জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত টারবাইনের গতি বজায় রাখার জন্য যে-যান্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয় তার একাংশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জলশক্তিচালিত জেনারেটরে জলের গতিশক্তিতে টারবাইন ঘোরে। এক্ষেত্রে জলের শক্তিতে টারবাইন ঘোরে। অর্থাৎ, জলশক্তিচালিত জেনারেটরে জলের যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়।

মেনলো পার্কের জাদুকর এবং তাঁর চমকপ্রদ উদ্ভাবন

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপের পরিমাণ বেশি হলে পরিবাহী তারটি ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং আলো বিকিরণ করতে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়া কাজে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, টোস্টার ইত্যাদি যন্ত্র

উদ্ভাবিত হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, যখন বৈদ্যুতিক হিটার চালান হয় তখন হিটারের তারগুলো গরম হয়ে উজ্জ্বল এবং লাল হয়ে ওঠে। এ থেকে বিজ্ঞানীদের মনে হলো যে, তড়িৎ-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হয়তো আলোর উৎস নির্মাণ করা যাবে। এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসন।

আমেরিকার মিলান শহরে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এডিসনের জন্ম হয়। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, এডিসন স্কুলে-কলেজে পড়েন নি বললেই চলে। তিনি মাত্র মাস তিনেক একটি প্রাথমিক স্কুলে পড়েছিলেন। একদিন ঐ স্কুলের জনৈক শিক্ষক তাঁকে দৈহিক পীড়ন করে এবং তিরস্কার করে বলে, 'তুমি একটি অপদার্থ। তোমার দ্বারা জীবনে কিছু হবে না।'

এডিসনের মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। এডিসনের প্রতি তাঁর শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের কথা জানতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এডিসনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং নিজেই তাঁকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন। এতে আশ্চর্য ফল হলো। পড়াশুনোর প্রতি এডিসনের আগ্রহ বেড়ে গেল এবং তিনি দ্রুত নানান বিষয় আয়ত্ত করতে লাগলেন।

টম মাত্র ১২ বছর বয়সে চাকরীর সন্ধান করতে লাগলেন। সে সময় পোর্ট হারন্ থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত নতুন রেললাইন বসেছে। এডিসন রেলের যাত্রীদের কাছে খাবারদাবার এবং খবরের কাগজ বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন। এডিসনের বয়স অল্প ছিল বলে প্রথমে তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু এডিসন বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করে নিলেন। টমের ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। রেলপথে ফেরি করে তিনি ভালই রোজগার করতে লাগলেন।

ট্রেন ডেট্রয়েট স্টেশনে এসে পাঁচ'ছ ঘণ্টা দাঁড়াতো। এ সময়টা কাজে লাগানোর জন্য টম ডেট্রয়েট-এর একটি পাবলিক লাইব্রেরির সভ্য হয়ে গেলেন। এ লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ে বহু বই ছিল। টম বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলো পড়ে ফেলতে লাগলেন। একদিন রসায়নশাস্ত্রের ওপর লেখা একটি বই পড়ে তিনি এ বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং স্থির করলেন যে, তিনি রসায়নবিদ্ হবেন।

এডিসন জানতেন যে, বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে হলে হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। কাজেই তিনি স্থির করলেন, রসায়নের একটি ল্যাবরেটরি তৈরী করবেন। এ সময় রেলগাড়িতে ফেরি করে যা উপার্জন করতেন তার একাংশ তিনি বইপত্র কিনে ব্যয় করতেন। রসায়নে আগ্রহী হবার পর তিনি বেশ কিছু অর্থব্যয় করে নানান রাসায়নিক দ্রব্য কিনে ফেললেন এবং কণ্ডাক্টরের অনুমতি নিয়ে ট্রেনের একটি মালবাহী কামরায় রসায়নের একটি পরীক্ষাগার খুলে বসলেন।

কিন্তু ট্রেন যখন লাইনের উপর দিয়ে হেলে-দুলে চলে তখন সেখানে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো খুবই কষ্টসাধ্য। একদিন একটি রাসায়নিক পদার্থ-ভরা বোতল উল্টে পড়লো। ফলে মালবাহী কামরায় আগুন ধরে গেল। এ ঘটনায় কণ্ডাক্টর রেগে গিয়ে এডিসনের পরীক্ষাগারের সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এর পর আর ট্রেনের মধ্যে ল্যাবরেটরি রাখা সম্ভবপর হলো না। তাই বাবার অনুমতি নিয়ে বাড়িতেই রাসায়নিক পরীক্ষাগার বানিয়ে নিলেন।

বিদ্যুৎ-সম্পর্কে, বিশেষ করে টেলিগ্রাফি-সম্পর্কে, এডিসনের ছিল গভীর আগ্রহ। একদিন এডিসন রেল-এর একজন টেলিগ্রাফ অপারেটরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে কী ভাবে তারের মধ্যে দিয়ে বার্তা পাঠানো হয় ?'

উত্তরে অপারেটর বললেন, 'মনে করো টেলিগ্রাফ লাইন একটা লম্বা কুকুর। তার মাথা থেকে লেজের দূরত্ব কয়েক শ' মাইল। যখন কেউ ঐ কুকুরের লেজ টেনে ধরে তখন মাথাটা ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। এভাবেই, এক প্রান্তের খবর মুহূর্তে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়।'

বলা বাহুল্য, এ উত্তরে এডিসন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু লেজ থেকে খবরটা মাথায় আসে কোন্ পদ্ধতিতে ?'

অপারেটর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'এত কথা আমার জানা নেই বাপু।'

এডিসন এর পর বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে টেলিগ্রাফি সম্পর্কে পড়াশুনা করতে লাগলেন। কেবল তাই নয়, জিম ক্লানসী

নামে তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে একটি টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করলেন। লাইনটির এক প্রান্ত ছিল এডিসনের বাড়িতে এবং অন্য প্রান্তটি ছিল তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। দুই বন্ধু দীর্ঘকাল চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ঐ লাইনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের একদিন একটি বিশেষ ঘটনার ফলে আকস্মিকভাবে এডিসনের জীবনে টেলিগ্রাফি শেখার একটি সুযোগ এসে গেল। এডিসন তখনও ট্রেনে খবরের কাগজ ফেরি করে। একদিন ট্রেনটি কয়েকখানা মালবাহী বগি লাগিয়ে নেবার জন্য একটি স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। এডিসন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, একটি দু'তিন বছরের শিশু রেললাইনের উপর বসে নিশ্চিন্তে পাথরের নুড়ি নিয়ে খেলা করছে। ঠিক তখনই মালবাহী বগিগুলো ঐ লাইন দিয়ে এগিয়ে আসছিল মৃত্যুদূতের মতো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বগিগুলো আত্মভোলা শিশুটিকে চাপা দিয়ে পিষে ফেলবে। এডিসন তৎক্ষণাৎ হাতের খবরের কাগজ ফেলে লাফিয়ে পড়লেন রেললাইনের উপর এবং বগিগুলো এসে পড়ার আগেই কোন-ক্রমে শিশুটিকে তুলে নিয়ে লাইন থেকে সরে আসতে পারলেন।

শিশুটি ছিল ঐ স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটর মিঃ মেকেঞ্জির ছেলে। ছোট্ট ছেলে জিমি বাবার পাশেই বসে ছিল। হঠাৎ পরের স্টেশনে একটা জরুরী বার্তা পাঠানোর ব্যাপারে মিঃ মেকেঞ্জি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই ছেলের ওপর নজর রাখতে পারেন নি। এ সুযোগে জিমি গুটি গুটি পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে রেললাইনের উপর বসেছিল। হঠাৎ ছেলেকে পাশে দেখতে না পেয়ে মিঃ মেকেঞ্জি উদ্বিগ্ন হয়ে রেল-লাইনের দিকে ছুটে গেলেন এবং দেখলেন যে, জিমি রেললাইনের উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর একটা রেলগাড়ি এগিয়ে আসছে তার দিকে। এ দৃশ্য দেখে মিঃ মেকেঞ্জি এতই বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে এলো। ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আতঙ্কে মিঃ মেকেঞ্জির চোখ বুজে আসছিল। আর ঠিক তখনই অভাবনীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল। এডিসন চকিতে রেললাইনের উপর লাফিয়ে পড়ে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রেললাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আনন্দে কেঁদে ফেললেন মিঃ মেকেঞ্জি। এডিসনকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তুমি আমার ছেলেকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু বিনিময়ে তোমাকে কিছু দেবার মতো সঙ্গতি আমার নেই। তবে, তুমি যদি টেলিগ্রাফি শিখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে তা শেখাতে পারি।'

মিঃ মেকেঞ্জির প্রস্তাবে এডিসন সাগ্রহে রাজি হলেন এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে টেলিগ্রাফি শিখতে লাগলেন। তিন মাসের মধ্যেই তিনি নিপুণ টেলিগ্রাফার হয়ে উঠলেন। তিনি ট্রেনে ফেরি করার কাজ ছেড়ে দিলেন এবং পার্টটাইম টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কানাডার স্ট্যাটফোর্ড-এ রাত্রি-কালীন অপারেটর পদে চাকরী নেন। রাত্রে কাজ করতেন বলে এডিসন পড়াশুনো এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেশি সময় দিতে পারছিলেন। এজন্য এডিসন তাঁর নতুন চাকরী পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন।

রাত্রের অপারেটররা সারারাত ধরে কাজ করছে নাকি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য টেলিগ্রাফ লাইনের মালিকপক্ষ রাত্রের অপারেটরদের কাছে একটি করে হুকুমনামা পাঠালেন। তাতে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, প্রত্যেক অপারেটরকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর হেড অফিসে একটি সাংকেতিক বার্তা টেলিগ্রাফ করে পাঠাতে হবে। এডিসনের ক্ষেত্রে সাংকেতিক বার্তাটি ছিল সংখ্যা ৬-এর মোর্স কোড্। সঙ্গত কারণেই ব্যাপারটা এডিসনের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হতে লাগলো। আধ ঘণ্টা পর পর বার্তা পাঠাতে হতো বলে অবসর সময়টাও পড়াশুনো বা নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যয় করা অসুবিধেজনক হয়ে উঠেছিল। কীভাবে এই বিরক্তিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে এডিসন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা মতলব এলো। আচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করে আধ ঘণ্টা পর পর বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় না? কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এমন একটি যন্ত্র ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে ফেললেন যার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আধঘণ্টা পর পর নির্দিষ্ট সংখ্যা ছয়-এর কোড্‌টি হেড অফিসে চলে যেতো। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটি চালু হবার পর থেকে এডিসন একটানা নিজের কাজ করে যেতে পারতেন, কেননা প্রতি আধঘণ্টায় একবার হেড অফিসে সাংকেতিক বার্তা পাঠানোর চিন্তা আর তাঁকে করতে হতো না।

কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে নিজের পড়াশুনো এবং গবেষণার কাজ করে যাবার ভালো ব্যবস্থাই উদ্ভাবন করেছিলেন এডিসন। কিন্তু বেশিদিন তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটির সুবিধে নিতে পারলেন না। কিছু-দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, টেলিগ্রাফ লাইনের মালিকপক্ষ এডিসনের উদ্ভাবনী প্রতিভায় খুশি হতে পারলেন না। ফলে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তাতে এডিসনের পক্ষে সম্মানের সঙ্গে সেখানে চাকরী করে যাওয়া অসুবিধেজনক হয়ে পড়লো। তাতে অবশ্য এডিসনের বিশেষ বেকায়দায় পড়তে হয় নি, কেননা ভালো টেলিগ্রাফ অপারেটরদের তখন যথেষ্ট চাহিদা ছিল। ফলে সহজেই তিনি আর একটি কাজ জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু একাজেও তিনি বেশিদিন টিকে থাকতে পারলেন না। টেলিগ্রাফ অফিসের রুটিন বাঁধা কাজ তাঁর ভালো লাগতো না। তাই সব সময় চাইতেন নতুন কিছু উদ্ভাবন করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে। পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি বহু চাকরী বদল করেছিলেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফার হিসেবে তাঁর দক্ষতা বেড়েছে এবং তিনি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বেশকিছু উন্নতিসাধন করেছেন।

একুশ বছর বয়সে এডিসন বোস্টন শহরে যান এবং সেখানে গিয়েই টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ পান। এখানেও তিনি তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এক বছর পর তিনি নিউইয়র্কে যান এবং সেখানে গিয়ে চাকরীর সন্ধানে নানান জায়গায় ঘুরতে থাকেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতেই তিনি একদিন হাজির হয়েছিলেন লজ-এর গোল্ড রিপোর্টিং টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে। এ কোম্পানি বিভিন্ন শহরে সোনার দামের হ্রাসবৃদ্ধির খবরাখবর পাঠাতো এবং অন্যান্য শহর থেকেও অনুরূপ খবর আনতো টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। এসব খবরের লেনদেন খুব তাড়াতাড়ি করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা থাকতো।

এডিসন যখন লজ কোম্পানির সঙ্গে দেখা করে চাকরীর আবেদন করার সুযোগ খুঁজছিলেন সে সময় অফিসে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। অফিসের প্রত্যেককেই উদ্বিগ্নভাবে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছিল। এডিসন বুঝলেন, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি অফিসে ঢুকে ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করলেন। কোম্পানির

জটিল টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি বিকল হয়ে বসে আছে। মালিক মিঃ লজ যন্ত্রটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর একে ওকে ডাকছেন অকেজো যন্ত্রটাকে সারিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে মিঃ লজকে সাহায্য করতে পারছে না। এডিসন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। যন্ত্রটা নতুন ধরনের। এডিসন যে-সব যন্ত্র নিয়ে এতোকাল কাজ করেছেন এ যন্ত্রটা সে-রকম নয়, তবু এডিসনের মনে আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি যন্ত্রটিকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। উদ্বিগ্ন মিঃ লজকে উদ্দেশ্য করে এডিসন বললে, 'স্যার, আশা করি আমি যন্ত্রটিকে সারিয়ে দিতে পারবো।

এডিসনের দিকে তাকিয়ে মিঃ লজ তেমন ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু মিঃ লজ তখন অসহায়। যন্ত্রটিকে সারিয়ে তোলার জন্য যে-কোন রকম চেষ্টা করতেই তিনি প্রস্তুত। কাজেই এডিসনের প্রতি আস্থা রাখতে না পারলেও বললেন, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখো সারাতে পার কিনা।'

এডিসন এগিয়ে গেলেন যন্ত্রটার দিকে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই যন্ত্রটির গোলমাল সারিয়ে দিলেন। এডিসনের কর্মদক্ষতায় মিঃ লজ খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি অপরিচিত যুবকটির কাছ থেকে এতোটা আশা করতে পারেন নি। তিনি যুবকটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ রকম একটি লোককে কোম্পানিতে রাখতে পারলে ভালো হতো। আর ঠিক তখনই এডিসন তাঁর কাছে চাকরীর জন্য আবেদন করলেন। টেলিগ্রাফ যন্ত্রে এডিসনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানতে পেরে মিঃ লজ খুশি হলেন এবং মাসিক তিনশো' ডলার বেতনে তাঁর কোম্পানিতে বহাল করলেন। টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসেবে নয়, এডিসনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো কোম্পানির টেলিগ্রাফ যন্ত্রটিকে চালু রাখার এবং যন্ত্রটির উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করার। চাকরীটা এডিসনের খুবই পছন্দ হলো, কেননা এখানে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ তিনি পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, লজ কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় এডিসন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের নানান পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটিয়েছেন। এ সময় তিনি তাঁর বেশ কিছু উদ্ভাবনের পেটেন্ট পেয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এডিসন প্রথম সারির

উদ্ভাবক হিসাবে এবং তড়িৎ-বিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেন। এ সময় তিনি তাঁর উদ্ভাবিত নানান যন্ত্রকৌশলের স্বত্ব বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

অর্থের অভাব মিটে যাওয়ায় তিনি স্থির করলেন যে, অন্যের অধীনে আর কাজ করবেন না। নিজের ইচ্ছামতো গবেষণার এবং উদ্ভাবনের কাজ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে নিউ জের্সির নিউআর্কে তিনি একটি ল্যাবরেটরি এবং কারখানা স্থাপন করেন। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে বহু নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর কারখানাতে সে-সব যন্ত্র নির্মাণ করেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে এডিসন স্থির করেন যে, তিনি এর পর থেকে কেবল উদ্ভাবনের দিকেই মন দেবেন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগিয়ে যন্ত্রাদি নির্মাণের শিল্পোদ্যোগের ভার থাকবে অন্যান্যদের উপর। এডিসন নিউআর্ক ছেড়ে দিয়ে মেন্‌লো পার্ক নামে নিউ জের্সির একটি নির্জন গ্রামে চলে গেলেন। এখানে এসে তিনি একটি বাড়ি এবং উন্নত মানের একটি ল্যাবরেটরি তৈরী করে নিলেন। ট্রেনে মেন্‌লো পার্ক ছিল নিউ ইয়র্ক থেকে এক ঘণ্টার পথ। তবু, এ অঞ্চলে জনবসতি কম ছিল। নিরিবিলিতে বিজ্ঞান-সাধনা করার পক্ষে স্থানটি ছিল আদর্শ।

এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারে বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে সফল হতে পারছিলেন না। মেন্‌লো পার্কে আসার দু'বছর পর এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু করেন। এডিসন তাঁর জীবনে অসংখ্য উদ্ভাবন করে গেছেন। তবে, বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবনই বোধকরি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় তাপ এবং আলো উৎপন্ন হয় একথা দীর্ঘদিন থেকেই জানা ছিল। উচ্চ বৈদ্যুতিক রোধসম্পন্ন কোন তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে এতে তাপ উৎপন্ন হয়, ফলে তারের উষ্ণতা বাড়ে। উৎপন্ন তাপের পরিমাণ বেশি হলে তারটি অতি উত্তপ্ত এবং ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। এডিসন একটি তড়িৎ-বর্তনীতে একটি সরু তারের তন্তু বা ফিলামেণ্ট যুক্ত করে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালেন। তিনি দেখলেন যে, ফিলামেণ্টটি উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল আলো দিতে লাগলো। কিন্তু এ আলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উৎপন্ন তাপের ক্রিয়ায় ফিলামেণ্টটি কেটে গেল।

এডিসন জানতেন যে, অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই কোন বস্তু জ্বলে যায়। তাঁর মনে হলো যে, যদি ফিলামেণ্টটিকে শূন্যস্থানে রাখা যায় তাহলে হয়তো উত্তপ্ত অবস্থায় সেটি আর জ্বলে যাবে না। তাঁর অনুমান সত্যি কিনা তা যাচাই করার জন্য তিনি একটি কাচের গোলক নির্মাণ করে তার মধ্যে একটি ফিলামেণ্ট স্থাপন করে পাম্পের সাহায্যে ঐ গোলকের সমস্ত বায়ু বের করে নিলেন। এর পর তিনি ঐ ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালেন। ফিলামেণ্টটি ভাস্বর হয়ে আলো বিকিরণ করতে লাগলো। এবার কিন্তু ফিলামেণ্টটি আগের মতো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কেটে গেল না। কেটে যাবার আগে ফিলামেণ্টটি আট মিনিট ধরে আলো দিল।

বিজ্ঞানী টমাস আল্‌ভা এডিসন

এডিসন বুঝলেন যে, তিনি সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। এর পর তিনি বৈদ্যুতিক বাতির উপযুক্ত ফিলামেণ্ট-এর সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পরীক্ষায় প্ল্যাটিনামের তার ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু প্ল্যাটিনাম ধাতুটি অত্যন্ত ভঙ্গুর। এছাড়া এ ধাতুর ব্যবহার খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ। কাজেই বৈদ্যুতিক বাতির তন্তু হিসেবে প্ল্যাটিনামের তার খুব সুবিধেজনক নয়। এর পর এডিসন কার্বন ফিলামেণ্ট ব্যবহার করার কথা ভাবলেন। বিশুদ্ধ কার্বন এ ব্যাপারে উপযুক্ত হবে না বিবেচনা করে এডিসন ফিলামেণ্ট হিসেবে কার্বনের প্রলেপযুক্ত সূতো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কার্পাস তুলোর তৈরী উপযুক্ত মাপের সূতোকে একটি বায়ুশূন্য চুল্লীতে উত্তপ্ত করলেন। এতে ঐ সূতোর উপর কার্বনের কালো

প্রলেপ পড়ে গেল। এভাবে তৈরী কার্বনের প্রলেপযুক্ত ফিলামেণ্টকে একটি বায়ুশূন্য বাল্‌বে স্থাপন করে এডিসন একটি বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণ করেন। বাতিটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ফিলামেণ্টটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে লাগলো। প্ল্যাটিনাম ফিলামেণ্টটি আট মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় নি, কিন্তু কার্বনের প্রলেপযুক্ত ফিলামেণ্টটি একটানা পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা আলো দিল। অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতিকে ঘরে ঘরে ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং আরো উন্নত মানের ফিলামেণ্ট প্রয়োজন।

এর পর এডিসন একটির পর একটি পদার্থ নিয়ে ফিলামেণ্ট হিসেবে তার উপযোগিতা কতটা তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। এক গ্রীষ্মের দুপুরে এডিসন এক পরিচিত ভদ্রলোককে বাঁশের হাতপাখা নাড়িয়ে হাওয়া খেতে দেখলেন। পাখাটা দেখেই এডিসনের মনে হলো বাঁশের আঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট তৈরী করলে হয়তো তা স্থায়ী হবে, তিনি ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে হাতিপাখাটা চেয়ে নিয়ে তা থেকে একটা তন্তু ছিঁড়ে নিলেন। বাঁশের তন্তুটিকে বাল্‌বের ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহার করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। এ পর্যন্ত তিনি ফিলামেণ্ট হিসেবে যতো পদার্থ ব্যবহার করেছেন বাঁশের তন্তুটি তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এর পর এডিসন বিভিন্ন জাতের বাঁশের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এ ব্যাপারে কোন্ বাঁশ সবচেয়ে ভালো হবে তাঁর সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি চীন, জাপান, ব্রাজিল, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য যে-সব স্থানে বাঁশ জন্মে সে-সব স্থানে লোক পাঠিয়ে নানান জাতের বাঁশের নমুনা সংগ্রহ করলেন এবং প্রায় ছ'হাজার নমুনার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন যে, জাপানী বাঁশই বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট-এর পক্ষে সবচেয়ে ভালো। এই ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্যে তাঁর খরচ হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ মার্কিন ডলার।

এর পর তিনি বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণে মন দিলেন। বাঁশের তন্তুর সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য জাপানে লোক পাঠিয়ে বাঁশ চাষের ব্যবস্থা করলেন তিনি। কিন্তু এ ব্যবস্থার আর প্রয়োজন হলো না। কয়েকদিন পরই এডিসন তুলা থেকে কৃত্রিম উপায়ে এক ধরনের ফিলামেণ্ট নির্মাণে সক্ষম হলেন যা বাঁশের চেয়েও ভালো।

এডিসনের বন্ধু মিঃ মার্শাল ফক্স ছিলেন নিউইয়র্কের বিখ্যাত

'হেরল্ড' পত্রিকার রিপোর্টার। এডিসনের আমন্ত্রণ পেয়ে মিঃ ফক্স এ সময় একবার মেন্‌লো পার্কে আসেন এবং সেখানে সপ্তাহ দুই কাটিয়ে যান। নিউইয়র্ক ফিরে গিয়ে মিঃ ফক্স এডিসনের গবেষণাগার এবং সেখানকার নানান গবেষণা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন হেরল্ড পত্রিকায় একটি শিরোনামা ছিল এরকম ঃ

বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কার! বৈদ্যুতিক বাতি এখন বাস্তব। এডিসনের কাচের বাল্‌ব রাত্রিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে।

এ সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। লোকের মুখে মুখে এডিসনের এই বিস্ময়কর উদ্ভাবনের কথা আলোচিত হতে লাগলো। তবে, অনেক লোকই এ সংবাদকে নিছক গালগল্প বলে মনে করলো। এডিসনের আগে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরাও এডিসনের এই অসাধারণ সাফল্যের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য এডিসন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার পরিকল্পনা করলেন।

এডিসন ঘোষণা করলেন যে, তিনি মেন্‌লো পার্কে নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করছেন এবং যাঁরা আগ্রহী তাঁরা সবাই এ উৎসবে যোগ দিতে পারেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, এ উৎসবে তিনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে উৎসব-আঙ্গিনা আলোকিত করবেন। নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়া থেকে অতিথিদের মেন্‌লো পার্কে আনার জন্য কয়েকটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলো এবং এডিসন নিজেই এসব ট্রেনের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

এডিসনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রায় হাজার তিনেক লোক নির্দিষ্ট দিনে মেন্‌লো পার্কে এসে জড়ো হলো। কেউ এলো বিশেষ ট্রেনে, কেউ এলো ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ বা এলো পায়ে হেঁটে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। হাল্‌কা তুষারপাত হচ্ছিল তখন। অতিথিরা যখন সবাই সমবেত হয়েছে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বিপুল জনতা গভীর কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষমান। অকস্মাৎ চারদিক চোখ-ধাঁধানো আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এডিসন কেবল একটি সুইচ্‌ টিপে দিলেন। আর এক-

সঙ্গে অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠে অন্ধকার রাতকে আলোকময় দিনে পরিণত করলো। চারপাশের গাছপালা ও ঘরবাড়িকে শত শত বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। 'মেন্‌লো পার্কের জাদুকর' বিজ্ঞানী এডিসন যেন আকাশের অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীর বুকে। সমবেত জনতা বিস্ময়াপ্লুত আনন্দে এবং উত্তেজনায় কোলাহলমুখর হয়ে উঠলো এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞানীটির উদ্দেশ্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করলো। তারা মনে মনে স্বীকার করলো, 'হেরল্ড' পত্রিকার সংবাদে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। এডিসন সত্যি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎকে স্থায়ী দ্যুতিতে পরিণত করার রহস্য আয়ত্ত করেছেন তিনি

অতিথিদের অনেকে এডিসনের গবেষণাগার দেখতে ঢুকলেন। চারদিকে নানান যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে। অতিথিরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হঠাৎ একজন মহিলার ভয়ার্ত চিৎকারে সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। এডিসন এবং অন্যান্যরা এগিয়ে গেলেন তার দিকে এবং দেখলেন, মহিলার চুলের বেণীটি একটি যন্ত্রের সঙ্গে আটকে গেছে। এডিসন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। প্রাণ খুলে হেসে নিলেন এডিসন। তারপর মহিলাটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। মহিলাটি যে-কাঁটা দিয়ে চুল বেঁধেছিলেন সেটি ছিল লোহার। যখন তিনি জেনারেটর-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জেনারেটরের শক্তিশালী চুম্বকের আকর্ষণে লোহার কাঁটা স্থানচ্যুত হয়ে যায়, ফলে মহিলার খোপাটি খুলে গিয়ে জেনারেটরের সঙ্গে আটকে যায়। কুন্তলিনীকে জেনারেটরের বাঁধন থেকে মুক্ত করলেন এডিসন। তারপর দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মহিলাটিকে বললেন, "ম্যাডাম, আপনি বোধ করি ওটা পড়েন নি।"

দরজায় সাদা কাগজের ওপর মোটা হরফে লেখা একটি পোস্টার লাগানো ছিল। তাতে লেখা ছিল ঃ 'যাঁদের সঙ্গে লোহার হেয়ার পিন কিংবা ঘড়ি আছে তাঁরা জেনারেটরের চুম্বক থেকে সর্তক থাকবেন।' মহিলাটি সময় মতো সতর্কবাণীটি দেখতে পান নি বলেই এ বিপত্তি।

নববর্ষ উৎসবে এডিসন প্রমাণ করে দেখালেন যে, বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকার রাত্রিকে আলো-ঝল্‌মলে করে তোলা যায়। কিন্তু ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার শুরু হবার পথে তখনো কিছু বাধা ছিল।

সে সময় খুব বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো না। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইনের জন্য এবং কয়েকটি কারখানার জন্য যেটুকু বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ তখন উৎপন্ন হতো না। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে হলে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ থাকতে হবে। কাজেই ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে আগে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করে প্রতিটি ঘরে তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এডিসন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি নিউইয়র্কে একটি বিদ্যুৎ-শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করবেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিউইয়র্কে চলে এলেন এবং সেখানে একটি অফিস খুলে বসলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন শুরু করার আগে আর একটি বড়ো সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন ছিল।

আমেরিকাবাসী তখনো বিদ্যুৎ সম্পর্কে ভীত ছিল। ঘরে বিদ্যুৎ আনলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হতে পারে, এ আশঙ্কায় তারা বাড়িতে বিদ্যুৎ আনতে সাহসী ছিল না। নিউইয়র্ক-বাসীদের মন থেকে এই আকর্ষণ আশঙ্কা দূর করার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এডিসন।

তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত রাস্তা ফিফ্‌থ এভেনিউ-এর ওপর রাত্রি-কালীন প্যারেডের ব্যবস্থা করেছিলেন। শতাধিক লোককে বর্গাকারে সাজানো হয়েছিল। এদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল একটি করে বৈদ্যুতিক বাতি। এডিসন আলোক-ধারী ব্যক্তিদের বর্গাকার সজ্জার ঠিক মাঝ-খানে চাকার ওপর একটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং একটি জেনারেটর বসিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেটর থেকে বেরিয়ে আসা সরু তারের সঙ্গে বর্গাকার সজ্জার প্রত্যেকের শিরস্ত্রাণ যুক্ত ছিল। এ ছাড়া, বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত ঘোড়া এবং বহু সংখ্যক রঙিন ব্যানার ছিল এই প্যারাডের অঙ্গ। ব্যাণ্ডের তালে তালে যখন এই আলোকসজ্জা নিউইয়র্কের প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন শহরবাসীরা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

এর কিছুদিন পর এডিসন নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চের নৃত্যানুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক আলোর আশ্চর্য ব্যবহার দেখিয়েছিলেন। এ অনুষ্ঠানে নতর্ক-নর্তকীদের হাতে ছিল আলোকোজ্জ্বল জাদুদণ্ড।

রঙ্গমঞ্চের তলায় লুকোনো জেনারেটরের সাহায্যে এই জাদুদণ্ডগুলোকে আলোকিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে আলো-ঝল্‌মলে জাদুদণ্ড হাতে নর্তক-নর্তকীদের নৃত্য দেখে দর্শকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল।

সংবাদপত্রগুলো এসব প্যারেড এবং মঞ্চানুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে লাগলো বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে কী করা যায়। ধীরে ধীরে বিদ্যুতের বাতি সম্পর্কে তাদের ভীতি কেটে গেল এবং অনেকেই তাদের বাড়িতে বিদ্যুতের আলো পেতে আগ্রহী হয়ে উঠলো।
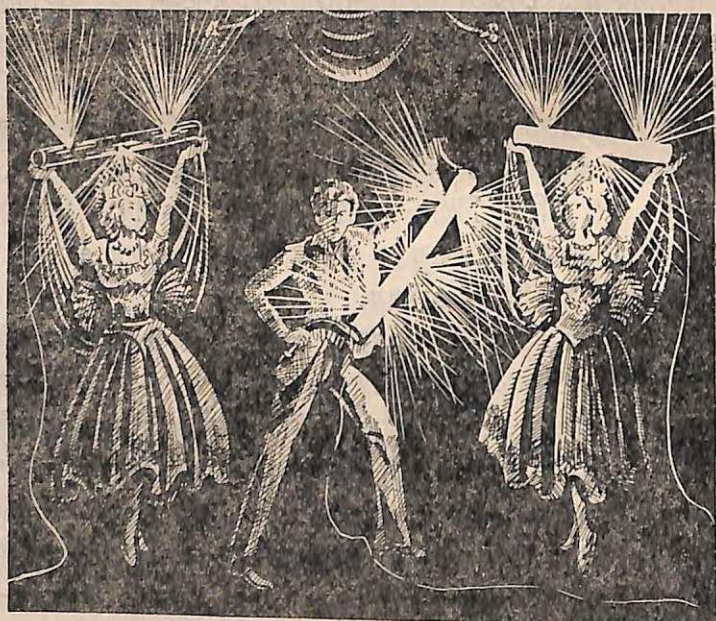
নর্তক-নর্তকীদের হাতে ছিল আলোকোজ্জ্বল জাদুদণ্ড

এডিসন যে কেবল প্যারেড আর অপেরা অনুষ্ঠান করেই সময় কাটাচ্ছিলেন তা নয়। তিনি একটি বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কেবল বিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরী করলেই হবে না। উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করতে হবে। এজন্য মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যেতে হবে। নিউইয়র্ক

শহরের মেয়র প্রথমে এ ব্যাপারে আপত্তি তুললেন। কিন্তু এডিসন বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মেয়রকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, তাঁর এ পরিকল্পনা রূপায়িত হলে শহরবাসীরা সত্যিই উপকৃত হবে।

এর পর এডিসন তাঁর এই প্রকল্পের জন্য অর্থ-সংগ্রহে বেরোলেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চাওয়া হলো। কিন্তু ব্যাঙ্কারেরা এ পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না বলে এডিসনকে প্রথমে ঋণ দিতে অস্বীকার করলেন। এডিসন হাল ছেড়ে দিলেন না। বেশ কিছুদিন কথাবার্তা চালানোর পর এডিসন কয়েকজন ব্যাঙ্কারকে তাঁর প্রকল্পের জন্য ধার দিতে রাজি করালেন। তাঁদের কাছ থেকে দশ লক্ষ ডলার ঋণ পাওয়া গেল। এই টাকায় "এডিসন ইলেকট্রিক ইলিউমিনেটিং কোম্পানি" স্থাপিত হলো। এই কোম্পানি নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দাদের আলো, তাপ এবং শক্তি সরবরাহের দায়িত্ব নিল।

বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ-সরবরাহ লাইন স্থাপনের জন্য নানান ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার হতে লাগলো এডিসনের। এ সব যন্ত্রপাতি আগে কারো দরকার হয় নি। কাজেই, এসব যন্ত্র কিনে নেওয়াও সম্ভবপর ছিল না। এডিসনের যে-সব যন্ত্রপাতির দরকার হচ্ছিল তার সব-কিছুই নিজেকে তৈরী করে নিতে হচ্ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিউইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কারখানা স্থাপন করলেন। এসব কারখানার কোনটিতে ডায়নামো, কোনটিতে নানান জাতীয় মিটার এবং কোনটিতে বিভিন্ন ধরনের ধাতব তার তৈরী হতে লাগলো। বহু সংখ্যক বৈদ্যুতিক ফিউজ, সুইচ্ ইত্যাদির প্রয়োজন হলো এডিসনের। এসবও তৈরী করে নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। একের পর এক সমস্যা দেখা দিতে লাগলো, আর এডিসন একটির পর একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করে সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে লাগলেন। সারা জীবনে এডিসন এক হাজারেরও বেশি পেটেণ্ট পেয়েছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু পেটেণ্ট তিনি পেয়েছিলেন বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির উপর। এ সময় তিনি অতি অল্প সময়ে এতগুলো নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন যে, পেটেণ্ট অফিসের ডিরেক্টর পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে এডিসনকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এডিসনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপনের এবং বিদ্যুৎ-সরবরাহ লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হলো। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট

মাসের শেষ দিকে এডিসন ঘোষণা করলেন যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর কোম্পানি বিদ্যুৎ-সরবরাহ শুরু করবে। এই ঘোষণা অনুসারে, ঐ দিন সন্ধ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে এডিসন একটি সুইচ্ টিপে বিদ্যুৎ-সরবরাহ লাইনে তড়িৎ-প্রবাহ প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ন'শো অট্টালিকায় চৌদ্দ হাজারের মতো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠলো।

ঐ সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের হেরল্ড পত্রিকার অফিসে মিঃ মার্শাল ফক্সের ডেস্কেও একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠেছিল। ঐ বাতির স্থির এবং উজ্জ্বল আলোয় বসেই মিঃ ফক্স পরের দিনের পত্রিকার জন্য এডিসনের অসামান্য সাফল্যের বিবরণ লিখছিলেন। তিনি লিখলেন:

'...তার বিরুদ্ধ সমালোচকরা যাকে অসম্ভব বলেছিল মেন্‌লো পার্কের জাদুকর তাকে দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত করেছে।'

এডিসনের এই সাফল্যে নিউইয়র্কের জনসাধারণ এতো উত্তেজিত হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকেই তাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি দাবি করতে লাগলো। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ইউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হলো। এডিসনের সাফল্য জনমানসে যে-উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল তা কেবল নিউইয়র্কের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রইলো না, অন্যান্য স্থানের জনসাধারণও বিদ্যুতের আলোর জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলো। অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ-সরবরাহ লাইন স্থাপিত হতে লাগলো। এর ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ এক অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিল। মানুষ বিদ্যুতের যুগে প্রবেশ করলো।

জোসেফ জন টমসন এবং ইলেকট্রন আবিষ্কার

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ এপ্রিল। সন্ধ্যার পর একজন নিঃসঙ্গ আগন্তুক এসে ঢুকলো কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে। ল্যাবরেট-

রিতে তখন আর কেউ ছিল না। জানালা দিয়ে মৃদু চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে। আর সেই আলোয় ল্যাবরেটরির নানান যন্ত্রপাতির দীর্ঘ এবং কালো ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। চাঁদের আবছা আলোয় আলোকিত যন্ত্রাদি এবং দেওয়ালের উপর তাদের ছায়া ল্যাবরেটরির পরিবেশকে ভৌতিক চেহারা দিয়েছে। আগন্তুক দরজা খুলে ধীরে ধীরে একটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপর ছিল একটি বিচিত্রদর্শন যন্ত্র। এতে ছিল একটি লম্বা কাচের নল। নলটির দুই প্রান্তে লাগানো
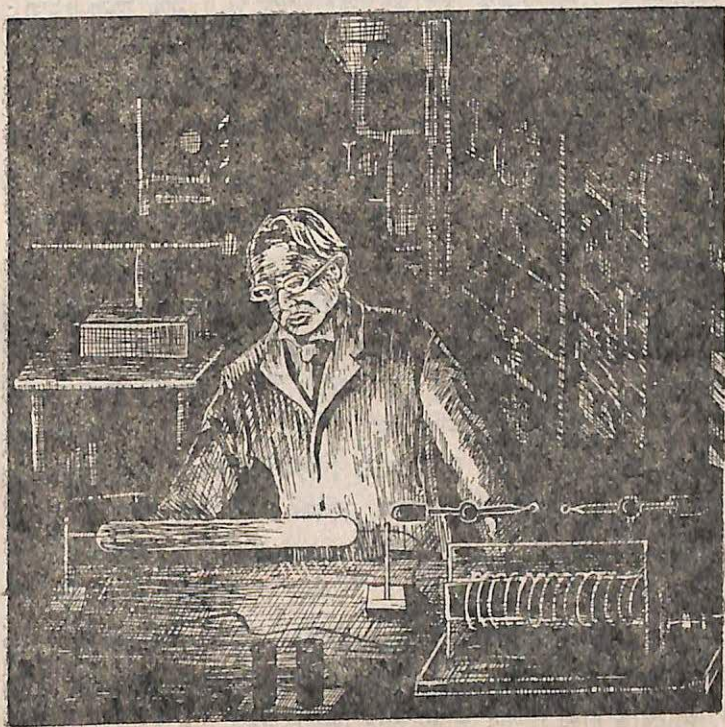
লোকটি নলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিষ্পলক চোখে ঐ আলোর আভার দিকে তাকিয়ে রইলেন

ছিল ধাতব তার। লোকটি একটি সুইচ্ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নলের এক প্রান্তে নীলাভ-সবুজ আলোর আভা ফুটে উঠলো। এই আলোর আভা অন্ধকার ঘরটাকে আরো রহস্যময় করে তুলালো। লোকটি নলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিষ্পলক চোখে ঐ আলোর আভার দিকে তাকিয়ে

রইলো। নল থেকে ঠিক্‌রে-বেরোনো নীলাভ সবুজ আলো লোকটির মুখে এসে পড়েছে। মুখের দু'পাশে ঝুলে-পড়া গোঁফ জোড়া দেখে এবার আর লোকটিকে চিনতে ভুল হবে না। সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গভাবে যিনি পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত গবেষণাগার ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকেছেন তিনি কোন অনধিকার-প্রবেশকারী নন। তিনি স্বয়ং বিজ্ঞানী জোসেফ জন টমসন, এই গবেষণাগারের ডিরেক্টর। নিরিবিলিতে কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তিনি এই সময়টি বেছে নিয়েছেন।

যে-নলটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছিলেন তার নাম ক্রুকস নল ; এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বায়ুশূন্য নল। বিজ্ঞানী টমসন বেশ কিছুদিন ধরে নিম্নচাপের গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-মোক্ষণ-সংক্রান্ত নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখেছেন যে, প্রায় বায়ুশূন্য নলের দুই প্রান্তে উচ্চ মাত্রার ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে ক্যাথোড থেকে একটি অজানা রশ্মি বেরিয়ে এসে নলের গায়ে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। বায়ুশূন্য নলের ক্যাথোড থেকে নিঃসৃত হয় বলে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় ক্যাথোড রশ্মি। এই রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন টমসন। তিনি দেখেছেন যে, তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এ রশ্মি বেঁকে যায়। এ থেকে টমসন সিদ্ধান্তে এলেন যে, ক্যাথোড রশ্মি তড়িৎ-ধর্মী। পরীক্ষার ফলাফল দেখে যদিও ক্যাথোড রশ্মিকে বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না, তবু টমসন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বায়ুশূন্য ক্রুকস্ নলের মধ্যে তো কিছুই নেই? তবে কি শূন্যস্থানের মধ্যেও বিদ্যুৎ থাকতে পারে? তা কী করে সম্ভবপর হবে?

অকস্মাৎ মনের সমস্ত দ্বিধা কেটে গেল। ক্ষীণ প্রতিপ্রভ আলোয় আলোকিত বিজ্ঞানী টমসনের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। হ্যাঁ, ক্যাথোড রশ্মি বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারে তিনি এখন নিশ্চিত। এই রশ্মি অসংখ্য তড়িৎ-গ্রস্ত কণা দিয়ে তৈরি। এই তড়িৎ-বাহী কণাগুলোই ক্রুকস্ নলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এসে নলের গায়ে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করছে। টমসন অনুমান করলেন, ধাতব তারের মধ্য দিয়ে যখন তড়িৎ-প্রবাহ চলে তখনও তারের মধ্য দিয়ে বোধকরি একই ধরনের তড়িৎ-গ্রস্ত কণা প্রবাহিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই তড়িৎ-বাহী সূক্ষ্ম কণাগুলো আসে কোথা

থেকে ? এ'দের স্বরূপই বা কী? এ কণাগুলো শূন্য থেকে কখনো উদ্ভূত হতে পারে না। তবে? তবে কি পদার্থের পরমাণু থেকে এই তড়িৎ-বাহী কণাগুলো বেরিয়ে আসে ? এই সম্ভাবনার কথা মনে হতেই বিজ্ঞানী টমসন চঞ্চল হয়ে পড়লেন। উত্তেজনায় ল্যাবরেটরির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। তাঁর অনুমান কি সত্যি ? তা যদি হয় তাহলে তো কুঠারাঘাত পড়বে বহু শতাব্দী ধরে আকড়ে-রাখা বিশ্বাসের মূলে। বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, পরমাণু অবিভাজ্য। তাঁর আবিষ্কৃত কণাগুলো যদি পদার্থের পরমাণু থেকেই বেরিয়ে এসে থাকে তাহলে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, পরমাণুর মধ্যেও সূক্ষ্মতর কণা রয়েছে ?

পরীক্ষা কখনো মিথ্যে বলে না। পরীক্ষালব্ধ সত্যকে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। টমসন বুঝলেন, এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন তিনি। ক্যাথোড-রশ্মির উপর তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব লক্ষ্য করে টমসন বুঝলেন যে, এই রশ্মির কণাগুলো ঋণ-তড়িৎ-গ্রস্ত। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, সমস্ত পদার্থের পরমাণু-তেই রয়েছে এরূপ ঋণতড়িৎ-গ্রস্ত কণা। টমসন এই কণার নাম দেন 'ইলেকট্রন'।

পরিণত বয়সে বিজ্ঞানী জোসেফ জন টমসন

টমসন এ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, পরমাণুর ইলেকট্রন-গুলো সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। টমসনের এ অভিমতের ভিত্তিতে তড়িৎ-বিজ্ঞানের অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। ঘর্ষণের ফলে কোন বস্তু তড়িৎ-গ্রস্ত হয় কেন, ধাতব তারের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে কেন—টমসনের মতবাদ থেকে এধরনের নানান প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ইলেকট্রনের অবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক

ঘটনা। এ আবিষ্কারে পদার্থের গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা আমূল বদলে গেল। পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় নিস্তড়িৎ। কাজেই, স্বাভাবিক অবস্থাতে এতে যতটা ঋণতড়িৎ থাকে ঠিক ততটুকুই ধনতড়িৎও থাকে। টমসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে, পরমাণুতে ঋণতড়িৎ-গ্রস্ত ইলেকট্রন থাকে। কাজেই, পরোক্ষভাবে এও বুঝা গেল যে, পরমাণুতে ধনতড়িৎও থাকে। এই আবিষ্কারের পর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা এবং গবেষণা শুরু হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এ সম্পর্কে নানান তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগলো এবং জন্ম হলো পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার, যার নাম 'পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী স্টিফেন গ্রে তাঁর বন্ধু গ্রেনভিল হোয়েলারকে এক সময় বলেছিলেন, 'গ্রেনভিল, আমার মনে হয় বিদ্যুতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলে বস্তুজগতের রহস্যও আমাদের কাছে আপনিই উদ্‌ঘাটিত হবে।' পদার্থের গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতো বাড়ছে ততোই আমরা বুঝতে পারছি বিজ্ঞানী গ্রের অনুমান মিথ্যে ছিল না। পরমাণুর জগৎ বস্তুত বিদ্যুতের জগৎ। সুতরাং, পরমাণুর প্রকৃতি জানতে হলে বিদ্যুতের স্বরূপ জানতে হবে।

ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কারের ফলে যে কেবল তড়িৎ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তাই নয়, বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন। বিজ্ঞানী টমসন তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেলেন। টমসন ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং তাঁর আবিষ্কারের সূত্র ধরে উদ্ভূত 'ইলেকট্রনিকস্'-এর বহু ইন্দ্রজাল তিনি প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

বেতার যুগের সূচনা

শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও যে বৈদ্যুতিক প্রভাব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে তা প্রথম লক্ষ্য করেন মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি

লক্ষ্য করেন যে, কোন পরিবাহীতে তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটলে নিকটবর্তী অন্য কোন পরিবাহীতেও তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয়। একটি পরিবাহী অন্যটিকে স্পর্শ করে না থাকলেও এক পরিবাহীর পরিবর্তনশীল তড়িৎ-প্রবাহ অন্যটিতে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। বৈদ্যুতিক প্রভাব শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে কেমন করে স্থানান্তরে যায় ফ্যারাডে তা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন স্কটল্যাণ্ডীয় বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ম্যাক্সওয়েল জন্মেছিলেন ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে—যে-বছর মাইকেল ফ্যারাডে তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন।

বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

ম্যাক্সওয়েল ছিলেন গণিতশাস্ত্রে পারঙ্গম। তিনি গাণিতিক যুক্তিতে দেখালেন যে, কোন স্থানে তড়িৎক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটতে থাকলে ঐ স্থানে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হয় এবং কোন স্থানে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটতে থাকলে ঐ স্থানে তড়িৎক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হয়। কেবল তাই নয়। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন যে, কোন স্থানে তড়িৎ ক্ষেত্রের বা চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটতে থাকলে ঐ চৌম্বক প্রভাব বা বৈদ্যুতিক প্রভাব শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় বলে একে বেতার তরঙ্গও বলা হয়।

ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর দশ বছর পর জার্মান-বিজ্ঞানী হাইনরিশ হাৎর্জ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করলেন। হাৎর্জ তাঁর সরল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যখন বেতার তরঙ্গের অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি অনুমানও করতে পারেন নি যে, তাঁর পরীক্ষালব্ধ

সত্যের ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঐন্দ্রজালিক উন্নতি সাধিত হবে। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, তাঁর আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের মতো কষ্টকল্পনাও বাস্তবায়িত হবে।

বিদ্যুতের রূপকথায় এর পর যে-কাহিনী বলবো সে-কাহিনীর নায়ক ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে গবেষণা করে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। নানান বিষয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে তিনি যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার নজির নেই। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা-জীবনের প্রথম পর্বে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন! এ প্রবণতার কারণ বুঝতেও অসুবিধে হয় না। জগদীশচন্দ্র যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র তখন থেকেই তিনি ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। লর্ড র‍্যালের আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন স্বয়ং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বীয় গবেষণার নানান নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র জগদীশচন্দ্র তাতে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে হার্ৎজ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। জগদীশচন্দ্র প্রথম থেকেই হার্ৎজের গবেষণার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। হার্ৎজের প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধ তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানী হার্ৎজের অকালমৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র সাঁইত্রিশ বছর।

বিলেতের অধ্যয়ন-পর্ব শেষ করে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে দেশে ফিরে এলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। হাতে তাঁর ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক ফসেটের লেখা একটি পরিচয়-পত্র। এই পরিচয়-পত্রটি তখনকার বড়লাট লর্ড রিপনের উদ্দেশ্যে লেখা। এই পরিচয় পত্র নিয়ে তিনি সিমলায় দেখা করলেন লর্ড রিপনের সঙ্গে। তিনি জগদীশচন্দ্রকে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। সে-সময় ভারতীয় অধ্যাপকেরা ইংরেজ অধ্যাপকদের তুলনায় অনেক কম বেতন পেতেন। জগদীশচন্দ্র এই নিয়মের প্রতিবাদে

তিন বছর কোন মাইনে নিলেন না। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষাবিভাগের কর্তারা জগদীশচন্দ্রের দাবি মেনে নিলেন এবং তাঁকে তাঁর ন্যায্য বেতন মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু কেবল অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেই জগদীশচন্দ্র তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ নভেম্বর তাঁর ছত্রিশতম জন্মদিনে তিনি অকস্মাৎ অনুভব করলেন, বিজ্ঞানসাধনাই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এ সময় থেকেই তিনি বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দেই বিজ্ঞানী হার্ৎজ মারা যান। জগদীশচন্দ্র হার্ৎজের প্রদর্শিত পথে গবেষণা শুরু করেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যন্ত্রপাতি বলতে কিছুই ছিল না। তাঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই তিনি নিজে তৈরী করে নিতেন। অসামান্য উদ্ভাবনী-প্রতিভার অধিকারী জগদীশচন্দ্র অকেজো টিনের পাত, লোহার চাকতি, কাঠের টুকরো—এ সব জিনিস দিয়ে তাঁর যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতেন নিপুণভাবে। সাধারণ কামার-মিস্ত্রীদের দিয়েই আশ্চর্যজনক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিতেন তিনি।

অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ইউরোপের বিজ্ঞানী-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানান পরীক্ষার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এবং দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ সমধর্মী। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি এ বিষয়ে একটি গবেষণা-নিবন্ধ পাঠ করেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে নানান গবেষণা করতে করতেই এক সময় জগদীশচন্দ্রের মনে হলো যে, এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে (বিনা তারে) বার্তা বা সংকেত পাঠানো সম্ভবপর হবে। সে-সময় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্রে 'কোহেরার' নামে একটি যন্ত্রিকা ব্যবহৃত হতো। ফরাসী বিজ্ঞানী ব্রানলি এই যন্ত্রিকাটির উদ্ভাবন করেন। জগদীশচন্দ্র এই কোহেরার যন্ত্রিকাটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। এতে বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। কিছু দিনের মধ্যেই ল্যাবরেটরির গণ্ডীর মধ্যে পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়ে দিতে সমর্থ হন যে, বেতার তরঙ্গকে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো যায়। কেবল তাই নয়, তাঁর পরীক্ষা থেকে এও বোঝা গেল

যে, এক স্থানে বসে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে অন্য স্থানের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বর্তমানে কোন স্থানে বসে দূরবর্তী অন্য কোন স্থানে অবস্থিত যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করার 'রিমোট কন্ট্রোল' পদ্ধতি চালু
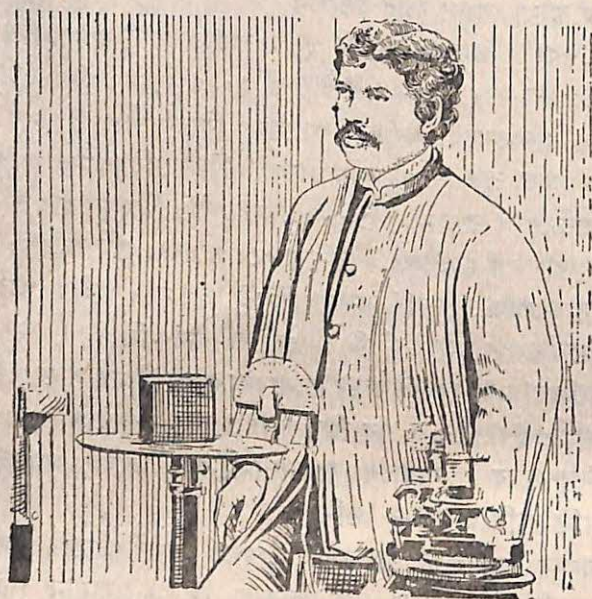
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু

হয়েছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র যে-পরীক্ষাটি প্রদর্শন করেছিলেন তার আগে অনুরূপ পরীক্ষায় কেউ সফল হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজে কয়েকজন বিজ্ঞানীর সামনে তিনি যে-পরীক্ষাটি প্রদর্শন করেছিলেন তারই অনুরূপ একটি পরীক্ষা তিনি করেছিলেন টাউন হলে। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন :

> অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে টাউন হলে এ সম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন।
> বিদ্যুৎ-ঊর্মি তাহার বিশাল দেহ এবং দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া

তৃতীয় কক্ষে নানা প্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ স্তূপ উড়াইয়া দিল।'

বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিদেশের বিজ্ঞানী-মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকা (ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত) এ অভিমত ব্যক্ত করলো যে, 'বর্তমান সময়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণ করার যতগুলো যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্র তাদের সকলকে হটিয়ে দিল।'

তখন স্যার হেনরি জ্যাকসন ছিলেন ব্রিটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ। তিনি এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে বার্তা পাঠানোর উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলেন দীর্ঘ দিন থেকে। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাতে সফল হলেন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের 'ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং' পত্রিকা লিখলো: 'যে-সব যুক্তি অনুসরণ করে অধ্যাপক বসু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন সেসব যুক্তি এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র প্রশংসার দাবি রাখে। অনুরূপ আর সব যন্ত্রের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। তবে আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোনভাবে গোপন রাখেন নি। এই যন্ত্রকে কাজে লাগাতে এবং এর সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে কারো কোন বাধা নেই।'

বিজ্ঞানের সত্য গোপন রেখে তাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে অর্থোপার্জনের কথা চিন্তাই করতে পারতেন না জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র যখন বেতার-তরঙ্গ বিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা প্রচার করার জন্য বিলেতে যান তখন একজন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলে, 'আপনি আপনার বক্তৃতায় সব কথা প্রকাশ করবেন না। আমাকে আপনার নামে একটি পেটেণ্ট করতে অনুমতি দিন। আপনি জানেন না কী বিপুল অর্থ আপনি হেলায় হারাচ্ছেন। আপনার উদ্ভাবিত যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা বেতার টেলিগ্রাফি কোম্পানি গড়ে তুলবো। এর ব্যয়ভার আমি বহন করবো। আর মুনাফার অর্ধেক আপনাকে দেবো।' কিন্তু জগদীশচন্দ্র এ অনুরোধে সাড়া দেন নি। এ প্রসঙ্গে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে তাঁর কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন:

'এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার মায়া দেখিতে! টাকা, টাকা! কী ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি একবার যাঁতা কলে পড়ি, তাহলে উদ্ধার নাই। দেখ, আমি যে-কাজ লইয়া আছি তাহা বাণিজ্যিক লাভালাভের উপর মনে করি। (তাই ক্রোড়পতির প্রস্তাবে) আমি অসম্মত হইলাম।'

এ সময় তিনি যদি বেতার-যন্ত্রের পেটেণ্ট নিতেন এবং ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বেতার-যন্ত্রের উন্নতি-সাধনে মন দিতেন তাহলে হয়তো বেতার-যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবে আজ তাঁরই নাম উচ্চারিত হতো। কিন্তু সে-কথা থাক্।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যখন কোলকাতায় বসে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তখন সুদূর ইটালীতে বসে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন গুগ্লিয়েল্মো মার্কনি নামে একজন তরুণ বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্রের মতো আর্থিক অসুবিধে মার্কনির ছিল না। তিনি জন্মে-ছিলেন এক বিত্তবান পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী এবং মা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত এবং ধনী আইরিশ পরিবারের মেয়ে।

ছোটবেলা থেকেই মার্কনি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে-ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই বিজ্ঞানের সমসাময়িক গবেষণার খোঁজ-খবর রাখতেন তিনি। তাঁর বয়স যখন আঠারো-উনিশ সে-সময় একটি ব্রিটিশ পত্রিকায় হাৎ´জের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে মার্কনির মনে একটি নতুন ভাবনার উদয় হলো। ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মতো তিনিও বুঝলেন যে, হাৎ´জীয় তরঙ্গের সাহায্যে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও বার্তা প্রেরণ সম্ভবপর হবে। বেতার টেলিগ্রাফি! মার্কনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, এ ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটবে এবং মানবসভ্যতা এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে কুড়ি বছরের তরুণ মার্কনি তাঁর বাড়িতে একটি গবেষণাগার তৈরী করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হন। মার্কনি যখন এসব গবেষণা করছিলেন তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, কিছুদিনের মধ্যেই

বেতারে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীতধ্বনি পাঠানো সম্ভবপর হবে। তিনি তখন ভাবতেও পারেন নি যে, মাত্র চল্লিশ বছর পরে ঘরে ঘরে থাকবে রেডিও গ্রাহক যন্ত্র, যে-যন্ত্রে ধরা পড়বে দূর থেকে সম্প্রচারিত সংবাদ, সঙ্গীত, নাটক এবং ভাষণ। মার্কনি কেবল বিনা তারে দূরবর্তী স্থানে বার্তা পাঠানোর উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বেতার তরঙ্গের সাহায্যে মোর্স-উদ্ভাবিত কোড্-এর 'ডট্' এবং 'ড্যাশ্' পাঠানোর এবং দূরবর্তী স্থানে তা লিপিবদ্ধ করার যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেছিলেন। এরপর মার্কনি 'অ্যারিয়েল'-এর উন্নতি সাধন করেন। হার্ৎজ ছোট বর্গাকৃতি পাতকে অ্যারিয়েল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কনি চল্লিশ ফুট লম্বা একটি খুঁটিকে 'অ্যারিয়েল' হিসেবে ব্যবহার করে তিনি বেতার তরঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দূরে পাঠাতে সমর্থ হলেন। অ্যারিয়েলের উন্নতি সাধন করে মার্কনি একটি সংকেত পাঠিয়ে পৌনে দু'মাইল দূরে সুস্পষ্ট-ভাবে তা ধরতে সক্ষম হলেন। মার্কনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। এরপর তরুণ মার্কনি ইটালী সরকারের কাছে আবেদন করলেন বিনা তারে বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে। কিন্তু 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' কথাটা এদেশে যেমন সত্য এদেশের বাইরেও তা কম-বেশি সত্য। কাজেই ইটালীর মাটিতে যে মার্কনির বিজ্ঞান-প্রতিভার কদর হবে না তাতে আর আশ্চর্য কী? মার্কনির নানান সফল পরীক্ষা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, বেতার টেলিগ্রাফি কোন কল্পনাবিলাস নয়, এর বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু ইটালী সরকার বেতার টেলিগ্রাফিকে অবাস্তব কল্পনা বলেই মনে করলো। কাজেই, মার্কনি তাঁর পরিকল্পনার রূপায়নে ইটালী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কনি ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন এবং সেখানে উনি তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের পেটেন্ট পেলেন। ইটালী সরকার তাঁর উদ্ভাবিত রেডিও টেলিগ্রাফি সম্পর্কে আগ্রহ না দেখালেও ইংল্যাণ্ডে অনেকেই সে-সম্পর্কে আগ্রহী হলো। ইংল্যাণ্ডের একদল ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে বেতারে সংকেত প্রেরণের পদ্ধতিকে উন্নত করে তা দিয়ে ব্যবসা করতে এবং মুনাফা লুটতে চাইলো। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই 'মার্কনি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কনির পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ

দেবার জন্য কোম্পানিতে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে প্রয়োগ করা হোলো। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কনি তাঁর যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি সাধনে সমর্থ হলেন। শীঘ্রই তাঁরা বিনা তারে আট মাইল দূরে সংকেত পাঠাতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এতেই মার্কনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি স্থির করলেন যে, বিনা তারে তিনি আটলান্টিক সমুদ্রের ওপারে সঙ্কেত পাঠাবেন। অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে, মার্কনির এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সফল হবে না। কিন্তু কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা মার্কনির সৃজনী প্রতিভার প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। তাই তাঁরা এ পরীক্ষার জন্য দু'লক্ষ ডলার খরচ করতেও ইতস্তত করলেন না। ব্রিটেনের পলধু শহরে প্রেরক যন্ত্রটি স্থাপন করা হলো। মার্কনি জাহাজে চেপে আমেরিকা চলে গেলেন এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উঁচু পর্বতে অবস্থিত সেইনট্ জনস্ নামক স্থানে বেতার সংকেত ধরার ব্যবস্থা করলেন। মার্কনি এ সময়ে উপযুক্ত এরিয়্যাল বা আকাশ-তারের কথা চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, প্রায় দেড়শো বছর আগে ফেলাডেলভিয়ার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক মুদ্রাকর আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ঝড়-বাদলার দিনে আকাশে যে বিজলী দেখা যায় গবেষণাগারে উৎপন্ন বিদ্যুতের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। মার্কনি ভাবলেন, আকাশ-তার খাটানোর জন্য ঘুড়ি ব্যবহার করলে কেমন হয়?

মার্কনি তাই স্থির করলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর। মার্কনি একটি ৫০০ ফুট লম্বা তারকে ঘুড়ির সাহায্যে উপরে তুলে দিলেন। এ তারটিই তাঁর গ্রাহক-যন্ত্রের আকাশ-তারের কাজ করবে। অন্য যন্ত্রপাতিগুলোও উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দিলেন মার্কনি। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে মার্কনি যখন তাঁর ঐতিহাসিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তিনি মনে মনে ভাবছিলেন তাঁর এই প্রয়াস সফল হবে তো? এতো সময়, এতো শ্রম, এতো অর্থব্যয় বিফল হবে না তো? আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা বুঝা যাবে। ঘড়ির দিকে তাকালেন মার্কনি। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। উত্তেজনায় মার্কনির শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর সহকারী মিঃ ফ্লেমিং আটলান্টিকের ওপারের পলধু থেকে সংকেত পাঠাতে থাকবে। মার্কনি তাঁর যন্ত্রপাতিগুলো শেষ বারের মতো দেখে নিলেন।

না, সবই ঠিক আছে। মার্কনি তাঁর সহকারী দু'জনকে প্রস্তুত হতে বললেন।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। নির্ধারিত লগ্ন সমুপস্থিত। মার্কনি আশা-আশঙ্কায় দোলায়িত চিত্তে গ্রাহক-যন্ত্রটি চালু করলেন। কিন্তু না। যন্ত্রে কেবল ঘর্-ঘর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে মার্কনি কান পেতে রইলেন। কয়েকটি উদ্বেগের মুহূর্ত। হঠাৎ মার্কনি যেন অর্থপূর্ণ কিছু একটা শুনতে পেলেন। মার্কনি তাঁর দুজন সহকারীকে ডেকে বললেন, 'দেখো তো কিছু শুনতে পাচ্ছ কিনা।' এবার তিন জনই কান খাড়া
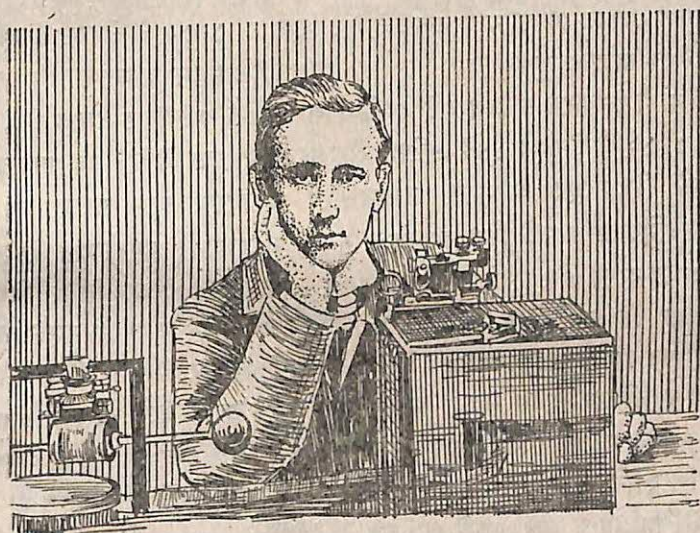
ইটালীয় বিজ্ঞানী গুগ্লিয়েল্মো মার্কনি

করে বসে রইলেন বেতার-তরঙ্গ-গ্রাহক যন্ত্রের সামনে। না, মার্কনি ভুল শোনেন নি। এবার তাঁরা তিনজনেই ক্ষীণভাবে তাঁদের প্রত্যাশিত শব্দটি শুনতে পেলেন গ্রাহক-যন্ত্রে। ডট্-ডট্-ডট্। ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মোর্স কোড। সংকেত হিসেবে এই শব্দই পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ফ্লেমিং-কে।

মানুষের পাঠানো বার্তা এই প্রথম সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে গেল। বেতার টেলিগ্রাফি আর স্বপ্ন নয়, তা এখন মানুষের করায়ত্ত। মার্কনি অসাধ্য সাধন করলেন। বিনা তারে পৃথিবীর এক

প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পলকে বার্তা পাঠানোর মতো কষ্টকল্পনাকেও তিনি বাস্তবায়িত করেছেন।

সাতাশ বছরের তরুন বিজ্ঞানী মার্কনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। প্রতিটি সংবাদপত্রে তাঁর অসামান্য সাফল্যের কথা প্রকাশিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো। শহরে শহরে বেতার প্রেরক-কেন্দ্র স্থাপিত হলো। ব্রিটিশ রণতরী বিভাগও কিছুদিনের মধ্যে তাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি যুদ্ধ-জাহাজে বেতার যন্ত্র বসিয়ে নিলো। কেবল যুদ্ধ-জাহাজেই নয়; যাত্রীবাহী জাহাজগুলোতেও অনুরূপ বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হলো। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের একটি মর্মান্তিক জাহাজ দুর্ঘটনার পর থেকে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সমস্ত যাত্রীবাহী জাহাজে চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও অপারেটর কর্তব্যরত থাকে।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল মাঝরাতে বিখ্যাত টাইটেনিক জাহাজ একটি হিমবাহের আঘাতে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জলমগ্ন হয়। টাইটেনিক জাহাজটি ছিল তখনকার সমস্ত যাত্রীবাহী জাহাজের চেয়ে আকারে বড়ো এবং সবচেয়ে বিলাসবহুল। হিমবাহের ধাক্কায় টাইটেনিক জাহাজ বিধ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে টাইটেনিক জাহাজ থেকে সঙ্কটাপন্ন যাত্রীদের রক্ষার জন্য বেতারে এস-ও-এস্ পাঠানো হয়েছিল। ঠিক সে-সময় ক্যালিফোর্নিয়ান নামে অন্য একটি জাহাজ টাইটেনিক জাহাজ থেকে মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার দূরে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ সময় ক্যালিফোর্ণিয়ান জাহাজে কোন রেডিও অপারেটর কর্তব্যরত ছিল না। কার্থাপিয়া নামে অন্য একটি জাহাজ টাইটেনিক থেকে পাঠানো বিপদ-বার্তা পেয়ে সঙ্কটাপন্ন যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য এসেছিল। কিন্তু কার্থাপিয়া জাহাজটি ছিল ঘটনাস্থল থেকে বেশ দূরে। কার্থাপিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর মিনিট কুড়ি আগেই টাইটেনিক জলমগ্ন হয়েছিল। টাইটেনিকে যাত্রী ছিল মোট দু'হাজার দু'শো চব্বিশ জন। তার মধ্যে এক হাজার পাঁচ শ' তের জন যাত্রী জলমগ্ন হয়ে মারা গিয়েছিল। দেরীতে হলেও বেতার বার্তা পেয়ে কার্থাপিয়া সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসায় যাত্রীদের মধ্যে সাত শ' এগার জনের জীবন রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছিল। হিমবাহের ধাক্কা লাগার পরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় টাইটেনিক ভেসে ছিল। যদি ক্যালিফোর্নিয়ান জাহাজে

কোন রেডিও অপারেটর কর্মরত থাকতো এবং যদি ঐ জাহাজ সময়মতো ঘটনাস্থলে আসতো তাহলে টাইটেনিক জাহাজের সমস্ত যাত্রীর প্রাণ রক্ষা হতে পারতো। এ ঘটনার পর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থির করা হলো যে, প্রতিটি যাত্রীবাহী জাহাজে সর্বক্ষণ বেতার অপারেটর কর্মরত থাকতে হবে।

মার্কনি যখন বেতার বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তখন তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, তাঁর এই উদ্ভাবন কাজে লাগিয়ে একদিন মানুষের কণ্ঠস্বর, ভাষণ, সঙ্গীত ইত্যাদিকেও আলোর গতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো সম্ভাপর হবে। মার্কনি যে-সময় আটলান্টিকের এক পার থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে অন্য পার থেকে তা ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন তার বছর ছ'য়েক পরে লি ছ্য ফরেস্ট নামে এক বিজ্ঞানী তৈরী করলেন 'ট্রায়োড ভাল্‌ভ' নামে এক যন্ত্রিকা। দেখা গেল, এ যন্ত্রিকার সাহায্যে ক্ষীণ তড়িৎ-সঙ্কেতকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা যায় ফরেস্টের এই উদ্ভাবন এবং অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের ফলেই কিছু দিনের মধ্যে রেডিও, টেলিভিসন, রাডার ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হলো।

বিপ্লব আনলো ইলেকট্রনিকস্‌

বিজ্ঞানী টমাস আল্‌ভা এডিসন যখন বৈদ্যুতিক বাতির উন্নতি সাধনের জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন সে-সময় তিনি আকস্মিক-ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে একটি ধাতব পাত স্থাপন করে তাঁর একটি ধারণাকে যাচাই করে দেখছিলেন। এই পরীক্ষাকালে তিনি দেখলেন যে, ঐ পাত এবং উত্তপ্ত ফিলামেণ্টের মধ্যে ব্যাটারী যুক্ত করে পাত থেকে ফিলামেণ্টের দিকে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠান যায়, কিন্তু কোন ভাবেই উত্তপ্ত ফিলামেণ্ট থেকে পাতের দিকে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠান যায় না। এডিসন যখন এ প্রক্রিয়া

আবিষ্কার করেন তখন বৈদ্যুতিক বাতি-সংক্রান্ত গবেষণার কাজে এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, এ বিষয়ে বিশদভাবে গবেষণা করতে পারেন নি।

এডিসনের এ আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ বিজ্ঞানী জন আমব্রোস ফ্লেমিং এ সম্পর্কে গবেষণা করতে আগ্রহী হন এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে দেন। জন ফ্লেমিং-এর জন্ম হয় ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে। লণ্ডনের রয়েল কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। রয়েল কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি কেম্ব্রিজে যান এবং ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটারিতে বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের অধীনে যোগ দেন। কেম্ব্রিজে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। লণ্ডনে অধ্যাপনা কালেই তিনি এডিসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর এ আগ্রহের একটি সঙ্গত কারণ ছিল। বিজ্ঞানী ফ্লেমিং বেতারে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন একটি যন্ত্রব্যবস্থার দরকার ছিল যার মধ্য দিয়ে কেবল একদিকেই তড়িৎ-প্রবাহ যেতে পারবে। ফ্লেমিং বুঝলেন, এডিসন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে এ ধরনের যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করা যেতে পারে। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি দুই তড়িৎ-দ্বারবিশিষ্ট একটি বায়ুশূন্য কুণ্ড তৈরী করলেন। দুই তড়িৎ-দ্বারবিশিষ্ট এই যন্ত্রব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক দিকেই তড়িৎ-প্রবাহ যেতে পারে বলে একে 'ডায়োড ভাল্‌ভ' বলা হয়। ফ্লেমিং-উদ্ভাবিত ডায়োড ভাল্‌ভের দুই তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে একটি হলো ফিলামেণ্ট আর অন্যটি হলো প্লেট। এই ভাল্‌ভে ব্যবহৃত হয়েছিল একটি কার্বন ফিলামেণ্ট। ফিলামেণ্টটিকে বেষ্টন করে স্থাপিত হয়েছিল একটি চোঙাকৃতি ধাতব পাত। এটিই ভাল্‌ভের প্লেট। এই ভাল্‌ভটির ক্রিয়া নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায় :

যখন ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয় তখন এটি উত্তপ্ত এবং ভাস্বর হয়ে ওঠে। এ সময় ফিলামেণ্ট থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হতে থাকে। ব্যাটারির ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বারকে প্লেটের সঙ্গে এবং ঋণাত্মক তড়িৎ-দ্বারকে ফিলামেণ্টের সঙ্গে যুক্ত করলে ফিলামেণ্ট-নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলো প্লেটের দিকে ধাবিত হয়। ফলে প্লেট এবং

ফিলামেণ্টের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। কিন্তু যখন ফিলামেণ্টটিকে ব্যাটারীর ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে এবং প্লেটটিকে ঋণাত্মক তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তখন প্লেট ফিলামেণ্ট-নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলোকে বিকর্ষণ করে। কাজেই এক্ষেত্রে ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলে না।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান বিজ্ঞানী লি দ্য ফরেস্ট ডায়োড ভাল্‌ভের ফিলামেণ্ট এবং প্লেটের মাঝামাঝি একটি সছিদ্র তৃতীয় তড়িৎ-দ্বার স্থাপন করে তিন তড়িৎ-দ্বারবিশিষ্ট একটি ভাল্‌ভ নির্মাণ করেন। একে বলা হয় ট্রায়োড ভাল্‌ভ। এই ভাল্‌ভের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর সাহায্যে দুর্বল তড়িৎ-সঙ্কেতকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা যায়। দূর থেকে আগত বেতার-সঙ্কেতকে এভাবে বিবর্ধিত করে নেওয়ার উপায় মানুষের করায়ত্ত হয়েছে বলেই বিংশ শতাব্দীতে রেডিও এবং বেতার টেলিফোনের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে।

ক্যাথোড-রশ্মি নল, ডায়োড ভাল্‌ভ ইত্যাদিতে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয় শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহের সাহায্যে। ডায়োড ভাল্‌ভে তড়িৎ-প্রবাহ একমুখী হয় ইলেকট্রনের বিশেষ তড়িৎধর্মিতার জন্য। ট্রায়োডে তড়িৎ-সঙ্কেত বিবর্ধিত করার পেছনেও আছে গ্রিডের সাহায্যে ইলেকট্রন প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ। এসব যন্ত্রের কার্যনীতিতে ইলেকট্রনের ভূমিকাই মুখ্য। তাই পদার্থবিজ্ঞানের যে-শাখায় অনুরূপ যন্ত্রের কার্যনীতি, ব্যবহার ইত্যাদি আলোচিত হয় তাকে 'ইলেকট্রনিকস্‌' বলা হয়। ইলেকট্রনিকস্‌ বহু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিগত সত্তর বছরে ইলেকট্রনিকসের উন্নতি আমাদের জীবনধারাকে আমূল বদলে দিয়েছে। কেবল ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের উদ্ভাবনই নয়, ইলেকট্রনিকস্‌-এর বর্তমান উন্নতির পেছনে আছে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আলোক-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং ট্রানজিস্টার উদ্ভাবন।

রেডিও গ্রাহক যন্ত্রে শব্দকে প্রথমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়। ঐ তড়িৎ-তরঙ্গ বিনা তারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্রে ঐ তড়িৎ-সঙ্কেতকে আবার শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। কোন চিত্র বা দৃশ্যকে যদি অনুরূপভাবে বেতারে দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে হয় তবে প্রথমে আলোক-সঙ্কেতকে

তড়িৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে নিতে হবে। এর পর ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে আবার আলোয় রূপান্তরিত করে ঐ চিত্র বা দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। টেলিভিসন ব্যবস্থায় তাই করা হয়।

আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করার উপায় প্রথম আবিষ্কার করেন উইলাওবাই স্মিথ। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্মিথ লক্ষ্য করেন যে, সেলেনিয়াম ধাতুর উপর আলো পড়লে এর বৈদ্যুতিক রোধ পরিবর্তিত হয়। কাজেই, কোন তড়িৎ-বর্তনীতে যদি একখণ্ড সেলেনিয়াম রাখা যায় এবং যদি ঐ সেলেনিয়াম খণ্ডের উপর আপতিত আলোর তীব্রতার পরিবর্তন করা হয় তবে বর্তনীর তড়িৎ-প্রবাহেরও পরিবর্তন ঘটে। এ প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগের অসুবিধে হলো এই যে, সেলেনিয়ামের উপর আপতিত আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তনীর তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে না। এই দুই পরিবর্তনের মধ্যে সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকে। আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করার আরও কার্যকরী পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় বিজ্ঞানী স্মিথের আবিষ্কারের কিছুকাল পরে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হালভাখ্‌স্ লক্ষ্য করেন যে, একটি পালিস-করা দস্তার পাতকে ঋণাত্মক তড়িতে আহিত করে তার উপর অতিবেগুনী রশ্মি ফেললে পাতটি দ্রুত নিস্তড়িৎ হয়ে যায়। কিন্তু দস্তাপাতকে ধনাত্মক তড়িতে আহিত করে অনুরূপভাবে বেগুনী আলো ফেললে পাতটি আধান হারায় না। লেনার্ড দেখালেন যে, ধাতব পাতের উপর অতিবেগুনী আলো পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং এর ফলেই ঋণাত্মক তড়িতে আহিত ধাতব পাত দ্রুত নিস্তড়িৎ হয়ে যায়। এর পর অলস্টার এবং গাইটেল নামে দুই বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সিজিয়াম ইত্যাদি পদার্থের উপর দৃশ্য আলো পড়লেও ঐ সব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। আলোর প্রভাবে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'আলোক-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া'। আলোক-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগেই টেলিভিসন উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাস্তার আলো জ্বালানো বা নেভানো, ফটোগ্রাফিক প্লেটে শব্দ গ্রহণ এবং শব্দের পুনরোৎপাদন ইত্যাদিতে আলোক-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হয়।

ট্রায়োড ভাল্‌ভের নানান ব্যবহারিক সাফল্যের ফলে বহু সংখ্যক

বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ফলে নানান ধরনের ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের উদ্ভাবন সম্ভবপর হলো। এ সব ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরী হয়েছে। কোন কোন যন্ত্রে বহু সংখ্যক ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হলো। এ সময় ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের কয়েকটি ব্যবহারিক অসুবিধে লক্ষ্য করেন। যে-সব যন্ত্রে ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয় সুইচ্‌ টিপলেই সে সব যন্ত্র কাজ শুরু করে না। ভাল্‌ভের ইলেকট্রন-নিঃসারী তড়িৎ-দ্বার উত্তপ্ত না হলে এরা কাজ শুরু করে না। ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভে কাচ ব্যবহৃত হয় বলে এরা ভঙ্গুর। এছাড়া, ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের আকার নেহাত ছোট নয় বলে বহু সংখ্যক ভাল্‌ভের সমবায়ে তৈরী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আকারে বড়ো হয়। এসব অসুবিধে লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা ভাল্‌ভের বিকল্প যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পরে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির একদল বিজ্ঞানী ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের বিকল্পের অনুসন্ধানে গবেষণা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ওয়ালটার ব্রাটেইন, উইলিয়ম শক্‌লে, জন বারডিন। এঁরা অর্ধপরিবাহী পদার্থ বা সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবহার করে 'ট্রানজিস্টর' উদ্ভাবন করেন।

পদার্থকে সাধারণত পরিবাহী এবং অপরিবাহী—এ দু'টো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পরিবাহী পদার্থগুলোর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ যেতে পারে। রূপো, তামা, অ্যালুমিনিয়াম—এসব ধাতু তড়িৎ-প্রবাহের সুপরিবাহী। কিন্তু কাচ, ব্যাকেলাইট, চীনামাটি ইত্যাদি পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ যায় না বলে এদের অপরিবাহী বলা হয়। অর্ধপরিবাহীগুলো একটি বিশেষ শ্রেণীর পদার্থ। বিশুদ্ধ অবস্থায় এরা অপরিবাহী কিন্তু এদের সঙ্গে উপযুক্ত খাদ মিশিয়ে দিলে এরা তড়িৎ-পরিবহণক্ষমতা লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে জার্মেনিয়ামের কথা বলা যায়। জার্মেনিয়াম বিশুদ্ধ অবস্থায় অপরিবাহী, কিন্তু সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক বা গ্যালিয়াম মিশিয়ে দিলে জার্মেনিয়াম তড়িৎ-পরিবহণে সক্ষম হয়। অর্ধপরিবাহীর ধর্ম কাজে লাগিয়ে ইতিপূর্বে ডায়োড ভাল্‌ভের তুল্য 'সেমিকণ্ডাক্টর ডায়োড' তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা অর্ধপরিবাহী

ব্যবহার করে তৈরী করলেন ট্রানজিস্টর। কার্যকারিতার দিক থেকে ট্রানজিস্টর ট্রায়োড ভাল্‌ভের তুল্য। কিন্তু ট্রানজিস্টর ব্যবহারের অনেক সুবিধে আছে। ট্রায়োড ভাল্‌ভের তুলনায় এরা আকারে ছোট। ট্রানজিস্টর ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের মতো ভঙ্গুর নয়। একথা বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ নির্মিত যন্ত্রের সুইচ্ অন্ করলেই কাজ শুরু করে না। এরূপ যন্ত্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠার জন্য কিছুটা সময় নেয়। কিন্তু ট্রানজিস্টর নির্মিত যন্ত্রে এ অসুবিধে নেই। এ সুইচ্ টিপ্‌লেই এ যন্ত্র কাজ শুরু করে। তাছাড়া, ট্রায়োড ভাল্‌ভের তুলনায় ট্রানজিস্টর তৈরী করা সহজতর এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য।

ট্রানজিস্টর উদ্ভাবিত হবার ফলে বহু আশ্চর্য যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, 'পেইস-মেকার' যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যে-সব হৃদ্‌রোগীর হৃদ্‌স্পন্দনের হার অনিয়মিত এবং অস্বাভাবিক তাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়মিত এবং স্বাভাবিক করার জন্য রোগীর বুকে এ যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ইলেকট্রনিক কমপিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়। এ যন্ত্রকে 'কৃত্রিম মস্তিষ্ক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কমপিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে এবং নির্ভুলভাবে নানান জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দেয়। বর্তমান গবেষকরা নানান বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে কমপিউটারের সাহায্য নিচ্ছেন। কমপিউটার তার 'স্মৃতি-ভাণ্ডার'-এ অসংখ্য তথ্য এবং উপাত্ত সঞ্চিত রাখতে পারে। কেবল তাই নয়, প্রয়োজনমতো সে-সব তথ্য এবং উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে নানান সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে-সব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য নিজেই নানান যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে পারে। কমপিউটারের ব্যবহারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। কমপিউটারের সাহায্যে চালক-বিহীন আকাশ-যানকে মহাকাশে পাঠিয়ে আবার তাকে পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হচ্ছে। ইলেকট্রনিকসের প্রভূত উন্নতি ছাড়া মানুষের পক্ষে চাঁদের মাটিতে পা দেওয়া এবং সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসা সম্ভবপর হতো না।

দুর্ভাগ্যবশত, যে-কোন বড়ো রকমের বৈজ্ঞানিক কৌশলকেই অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু যুদ্ধবাজ মানুষ সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য তৎপর হয়। কাজেই, ভবিষ্যতের যুদ্ধে যে ব্যাপকভাবে কমপিউটার

এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র-কৌশল ব্যবহৃত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? কমপিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নানান সম্ভাব্য সামরিক ব্যবহারের কথা শোনা যাচ্ছে। আগামী দিনের যুদ্ধে কমপিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র সুদক্ষ সেনানায়কের মতো রণকৌশল স্থির করবে, শত্রু-দেশের উপর গুপ্তচরের কাজ করে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন নানান গোপন তথ্য জানিয়ে দেবে, শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়ে তাদের ধ্বংস করবে।

বিদ্যুতের রূপকথা আজও শেষ হয় নি। আজও বিশ্বের নানান দেশে বহু সংখ্যক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী তড়িৎ-শক্তির নতুন নতুন প্রয়োগের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃতির রহস্যের শেষ নেই, তাই মানুষের অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। অশুভবুদ্ধিতে চালিত মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতালোভী এবং যুদ্ধবাজ মানুষ বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে লাগিয়ে যদি মানব-সভ্যতাকে বিপন্ন না করে তবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের রূপকথায় যে আরো গৌরবময় অধ্যায় সংযোজিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

———

আচার্য জগদীশচন্দ্র

—মণীন্দ্র ঘটক

যে-ঋষিপ্রতিম বিজ্ঞানীদের সাধনার ফলে আধুনিক মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি অব্যাহত, জগদীশচন্দ্র তাঁদের একজন। তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে তাঁর জীবন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এর কোনটিই বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই। ছোট-বড়ো সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে রচিত হয়েছে এই জীবনী। নিছক ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদির সমাবেশে প্রচলিত জীবনী-সাহিত্য রচনা না করে, সরস ও সাবলীল ভঙ্গিতে মহৎ বিজ্ঞানীর জীবন-প্রতিকৃতি এঁকেছেন লেখক। এ গ্রন্থ পাঠের পরে অনুভব করা যায় সাহিত্যরুচি জীবন-কাহিনীকে কত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ।

এটি **'বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা'-র** প্রথম গ্রন্থ। পৃথিবীর দিক্‌পাল বিজ্ঞানীদের জীবন-কাহিনী কিশোর ও তরুণ তথা ছোটবড়ো সকলের উপযোগী করে প্রকাশ করাই এ উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।